আগামীবারে সমাপ্য

মোহাম্মদ কাসেম

এম্পায়ার বুক হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

কবি আশ্‌রাফ আলী খান সাহেবকে

দিলাম-

—মোহাম্মদ কাসেম

'আগামীবারে সমাপ্য' লেখা শোধ হ'ল। কিন্তু যাঁর গুণে এর প্রকাশ, তাঁর ঋণ শোধ হবে না কোন কালেও।

'এম্পায়ার বুক হাউসের' মৌলভী মাহ্‌ফুজার রহ্‌মান খান সাহেবকে আমার এই অক্ষমতাটুকুই শুধু জানিয়ে রাখ্‌লাম।

কলিকাতা
১লা আগষ্ট
১৯৩৩

—কাসেম

আগামীবারে

সমাপ্য

অসীম ক্ষুধা আর নগ্ন দারিদ্র্য বয়সের মাত্রাটাকে বেমালুম হজম করেছে যা হোক্‌!

চকের তেপান্তায় মাথা রেখে যে পথটি বিবাগীর মতো সোজা পূবদিকে ছুটে গেছে সেই পথের সাথেই ওস্‌মানের মিতালী।

ওর চোখের দুয়ারে যেন ভাবীকালের উজ্জ্বল স্বপ্ন, দৃষ্টিতে যেন এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশের ইঙ্গিত।

খালি পায়ে সারাদিন পথে পথে টো টো করে। বেলা নিভে গেলে আবার এঁদো গলিটার ভেতর ফিরে আসে।

প্রত্যহ এমনি।

অন্ধকার অপরিসর খান দুই কুঠুরি। কোন মতে মাথা গুঁজে মাতা-পুত্রের দিন গুজরে যায়।

আগামীবারে সমাপ্য

প্রতিটি দিনের মতো সেদিনও সদর দরজার কড়াটা নড়ে উঠে ডাক পড়্‌ল :

—মা !

ডাক নয়, যেন বলদৃপ্ত বিজয়ীর হর্ষধ্বনি।

ভেতর থেকে জবাব এল—এই যে, এলাম বাবা !

ভেতরে ঢুকে পড়্‌ল তারপর।

আহারে বসে ওস্‌মান হেসে বল্‌ল—আজ বিড়ীর ফ্যাক্টরীতে একটা কাজ ঠিক করে এলাম। একটা হপ্তা কোনমতে চল্‌বে না ? কাজ দেখে এক হপ্তা পর মাইনে, পরে হাত চালু হ'লে হাজারকরা হিসেব। শিখে নিলে ঢের পয়সা—সে বেশ হবে কিন্তু, না মা ?—বলে নিজের মনেই খানিক হেসে নিলে।

যেন বহুদিন পর শুকনো চড়ায় আজ প্লাবন জেগেছে।

নির্ব্বোধ সারল্যের এই উচ্ছল ধারাটি কোথায় যেন আত্মগোপন করেছিল এতকাল।

তৃপ্তির একটা প্রশান্তি আজ অনেকদিনের পর মা'র মুখে ভেসে উঠ্‌ল। ওস্‌মানের মুখের দিকে চেয়ে মা যেন হঠাৎ স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেন :

যুগ যুগের স্বপ্ন। একটা সহজ সরল গতি, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, পুত্র আর পৌত্রে-ঘেরা হাস্যমুখরিত একখানি শান্ত স্নিগ্ধ নীড়।

আগামীবারে সমাপ্য

ওস্‌মান আবার বল্‌ল—শুন্‌ছ মা—

মা যেন হঠাৎ হোঁচট্‌ খেয়ে অতি পরিচিত এই মায়ার পৃথিবীতে আবার ফিরে এলেন।

—হ্যা বাবা শুন্‌ছি ত', বল্ না।

ওস্‌মান কল্ কল্ করে বলে চল্‌ল—উমেশ বলে যে ছেলেটা আমাদের সাথে পড়্‌ত, ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ্ পেয়েছিল যে, চিন্‌লে না তুমি?—ওই যে কালোপনা—মুখে বসন্তেরদাগ। যার দাদা বিলেত ফেরৎতা—হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিষ্টার—

উমেশ যেন হারিয়ে যাওয়া বইয়ের একটি পাতা।

মা হেসে উঠ্‌লেন। পরিতৃপ্তির হাসি।

—চিন্‌লুম ত', এখন বল্‌না ওর কি হয়েছে!

—ও-ই-ত' বিড়ীর ফ্যাক্ট্‌রী খুলেছে। মস্তবড় ফ্যাক্ট্‌রী। গোলাপী বিড়ী, দেদার কাটতি।—কারিকর সব কাতারে কাতারে।

ছেলেটির যেন বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই এক ফোঁটাও। কথা কইবার কী ঢং! ওর মা-ত' ব্যাপারটা বুঝ্‌তেই পারেন নি এতক্ষণ।

—ওঃ! উমেশ ফ্যাক্টরী খুলেছে?—তা' পড়া ছেড়ে দিয়েছে বুঝি?

—এই ত' গেল বছর, একজামিনের সময়। জিগ্‌গেস্ করেছিলুম,—'পড়া ছেড়ে দিলে কেন, উমেশ? এত ভাল মাথা

তোমার।' ও বল্‌লে,—'খালি খালি ইউনিভার্সিটির 'ট্রেড্‌মার্ক' নিয়ে আর কি হবে।—গোলামীর খেতাব। গোলামী করে' কি আর মানুষ বড় হতে পারে ভাই ?'

একটু চুপ করে' থেকে বল্‌ল—ভারি তেজিয়ান ছেলে।. কী বিরাট ফাঁদ পেতে বসেছে।

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে মা বল্‌লেন—ছাত্র সময়ের বন্ধু বলে কি উমেশ তোকে একটু রেয়াৎ কর্‌বে না ?—এক হপ্তা পর কেন মাইনে দেবে ?

এর উত্তর ওস্‌মানের জুয়াল না। অতল অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। ওর বোকা, বোবা চোখ দু'টি যেন বল্‌তে চায়—মানুষের এই ব্যবসা-রাজ্যে বন্ধুত্বের প্রবেশাধিকার নেই।

ওস্‌মান তখন ফ্যাক্টরীতে চলে গেছে।

মুদি তাগাদা কর্‌তে এসে বিনিয়ে বিনিয়ে কত কি বলে গেল। ওস্‌মানের মা ঘরে বসে বসে কতকটা শুনেছেন, কতকটা শোনেননি। হয়ত নিরুপায় অক্ষমতার ওপর বিদ্রূপ, হয়ত গালাগাল।

বাড়ীওয়ালা এসে হাঁক্ দিল—শুন্‌ছ, ওগো বেটি; ওস্‌মানের মা !

কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওসমানের মা সাড়া দিলেন।

বার দুই গলাটা খাঁকরে নিয়ে বাড়ীওয়ালা আরম্ভ করল—তোমরা যখন ভাড়া চালা'তে পারছ না—আমার কি দোষ। আমি অন্য ভাড়াটে ঠিক করে ফেলেছি। এক মাসের টাকা অগ্রিম, ছাখো, এই ছাখো, তার রশিদ ছাখো। পষ্ট লেখা আছে, নাম-ধাম সব।

ওসমানের মা নম্র স্বরে বল্‌লেন—ও আর দেখাতে হবে না, বাবা। এই দু'মাস হ'ল ওসমান কাজে লেগেছে,—যা' পেয়েছিলুম তা' আমাদেরই—।—একটু থেমে বল্‌লেন—এতদিন-ই-ত' মেহেরবাণী করে' আস্‌ছেন, আর কিছুদিন সবুর করুন। পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত চুকিয়ে দেব, আপনার।

বাড়ীওয়ালা যেন অকারণ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। বল্‌ল—ওসব কথায় চল্‌বেনা বাপু। আগামী মাসে বাড়ী তোমাদের ছেড়ে দিতেই হবে।

ওস্‌মানের মা সংক্ষেপে বল্‌লেন—আপনার ভাড়া মিটিয়ে দিলে ত' আর তুলে দেবেন না?—আর এতকাল এখানে আছি, কোথা-ই-বা যাই—

আগামীবারে সমাপ্য

বাড়ীওয়ালা দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ল—তা'ও আমি বলে দেব নাকি? আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি ত'! ভাড়া জোটেনা তবু—

তারপর চল্‌তে চল্‌তে বল্‌ল—যত সব ছোটলোক ভাড়াটে বসিয়ে—।—বলেই একটু থেমে, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বল্‌ল—এই যা' বলে গেলাম্! নইলে আমার দোষ দিতে পার্‌বে না কিন্তু।

লোকটির চেহারার মতো কথাগুলোও নিষ্ঠুর, ধারালো।

ওস্‌মানের মা-ত' একবারে থ' খেয়ে গেলেন।

তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে মনে মনে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। মনে হ'ল, সংসারে নিজের বল্‌তে যাদের কিছু নেই, ঝড়ো রাত্রে মাথা গলা'তে খড়ের চালটুকুও যাদের মেলে না—তাদের জীবনটাই বুঝি স্রষ্টার এক অবিচ্ছিন্ন অভিশাপ। তারা বুঝি এমনি আশ্রয়-লোভী, অন্যের দুয়ারে এমনি অসহায় ক্ষুধার্ত্ত-মুসাফির।

ওঁর মুখখানি কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যার মতো অবসন্ন মলিন হয়ে উঠেছে। হঠাৎ চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল।

—কি কচ্ছ, চাচি?

ওস্‌মানের মা চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে চাইলেন।—দেখ্‌লেন, পাশের বাড়ীর সেই শীর্ণকায় মেয়েটি। নাম তার ফালি।

আগামীবারে সমাপ্য

—এই যে, আয় ম ৷ ফালি।

ফালি যেন মনে মনে একটি অনির্ব্বচনীয় মমতার স্পর্শ পেল। মুহূর্ত্তের জন্য ফালির—কাঙাল কাহিল মুখের ওপর একটা সুকোমল প্রসন্নতা ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

ফালি কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে একটু ইতস্ততঃ করে' সাম্‌নের পিঁড়িটার ওপর বসে পড়্‌ল। তারপর একটা ঢোক গিলে বলে ফেল্‌ল—সের খানেক চা'ল ধার দেবে, চাচি?

একান্ত নিরুপায় ও ঠেকা না হ'লে যে ফালি কোন কিছুর জন্য তাঁর কাছে হাত পাতে না, তা' ওস্‌মানের মা ভালো করেই জানেন। আর বিপদ-আপদে, দুঃখে-দৈন্যে একমাত্র তাঁর কাছে এসেই যে ফালি দাঁড়ায়, একথাও তাঁর অজানা নেই।

অকস্মাৎ ওস্‌মানের মা'র বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল, তার ঘরেও যে আজ তেমনি অবস্থা! তবুও—

—আচ্ছা বোস্, দেখ্‌ছি আছে কি-না!—বলে ক্ষণকাল নিস্পন্দ হয়ে ফালির মুখের দিকে চেয়ে থেকে তারপর ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন।

এই সর্ব্বহারা মেয়েটির জন্য ওস্‌মানের মা'র বড় দুঃখ হয়। কতদিন এই মেয়েটির ছন্দহীন, বিপর্য্যস্ত জীবনের কথা মনে করে' তাঁর দু'চোখ সজল হয়ে উঠেছে। কতদিন

ঘরোয়া কত খুঁটিনাটি কথার ফাঁকে তাঁর অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ করে' উঠেছে। কতদিন তাঁর দু'টি স্নেহার্দ্র চোখের দৃষ্টি তুলে, অপরিসীম মমতার প্রলেপ দিয়ে ওর দুঃখটাকে মুছে দেবার চেষ্টা করেছেন।

এতবড় ব্যর্থতার ধাক্কা খেয়েও মেয়েটি কারো কাছে অভিযোগ করতে জানে না।

মানুষের কাছে ওর সত্যিকার পরিচয় নেই। কিন্তু অসীম কালের পটে হয়ত একটু ইতিহাস আছে। বড় করুণ, বড় মর্ম্মান্তিক সে ইতিহাস—

মানুষ করেছে অবিচার, যৌবন করেছে বিদ্রূপ, বিধাতাও যেন করেছেন বিশ্বাসঘাতকতা।

বাস্, এইটুকুই ওর জীবনের মূলধন।

কিন্তু একদিন ছিল—যেদিন মনে হ'ত, এই সংসারটা সুন্দর স্বপ্নের মতো অপরূপ।—মনে হ'ত, সর্ব্বংসহা স্নেহময়ী মাতা, ভগিনী, বান্ধবী। সেদিনের বেঁচে থাকার মধ্যে যেন একটা আনন্দ ছিল, একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন ফালি এমনি নির্ব্বিবাদে পরম নির্ভরতার সাথে তার স্বামী বদরুর কাছে সপে দিয়েছিল—তার নারী-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন-যৌবন, সবকিছু,—সেদিন ওর চোখে ছিল নীড় রচনার রঙিন স্বপ্ন, বুকে ছিল মাতৃত্বের সশঙ্ক কামনা।

আর আজ—

বেঁচে থাকার নাম করে নিজেকে বঞ্চনা করা, হত্যা করা। আজ তার শীর্ণ উপবাসী দেহ, আনন্দহীন জীবন, নিষ্প্রাণ বাসনা। —তোব্‌ড়ানো তার মুখ, দারিদ্র্য ও দুরবস্থার চাপে বাঁকানো তার দেহ।

আজ সংসারের সমগ্র রূপটি যেন বদ্‌লে গেছে।—কঠিন, রুদ্র।

এই সংসারের দিকে চেয়েই কতদিন ফালির চোখের কোল দিয়ে গড়িয়ে জলের ধারা নেমে গেছে। সংসার হয়ত দেখে দুঃখ করেছে, হয়ত বা মুখ ভ্যাঙ্‌চে হাততালি দিয়ে চলে গেছে শুধু।

একান্ত নিঃসম্বল নিরবলম্ব জীবনের বোঝা বইতে বইতে ফালি একেকদিন মৃত্যুর দুয়ারে অবিশ্রান্ত মাথা খুঁড়েছে। মাঝে মাঝে দেখা গেছে, রাত্রির ঘনায়মান আঁধারে, ধান পুকুরের শানবাঁধা ঘাটে গিয়েও ফিরে এসেছে—পারেনি।

ভয়ে নয়, দুর্লভ জীবনের মমতায় নয়, পারেনি শুধু ওই অপোগণ্ড ক্ষুধার্ত্ত ছেলে দু'টির 'মা' ডাকে।

খানিকপর ওসমানের মা ঘর থেকে ফিরে এসে বল্‌লেন—আজ আমাদের ঘরেও চা'ল বাড়ন্ত! যেটুকু আছে তা' আজ আমাদের কোনমতে চল্‌বে, তুই বরং—।—বলে ফালির হাতে একটা

সিকি গুঁজে দিলেন।—এই নে, তুই মুদি দোকান থেকে চা'ল কিনে নিয়ে যাস্!

ফালি আপত্তি করল না।

ওসমানের মা বল্লেন—সকালে নাস্তা-প্নানি কিছু হয়েছে, ফালি?

ফালি সে কথায় কাণ না দিয়ে বল্ল—কতবারই ত' পয়সা দিলে চাচি, কিন্তু তা' আর দিতে পারলুম কই! নিয়ে নিয়ে ত কেবল দোখজ-পেটকে ঠাণ্ডা করছি—কবে যে এসব দিতে পারব তা' খোদাই জানে।

—আগে ত' খেয়ে বাঁচ্! তোর হ'লে পরে দিস্, নইলে আমার কোন দাবী নেই। আর ছেলে দু'টোর দিকে একটু নজর রাখিস্। বেঁচে থাকলে বিপদের লাঠি। পেটের মাণিক, বেঁচে থাকলে সাত বাদ্শার ধন!

অতর্কিতে ফালির বুক থেকে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসল।

—বাঁচবে ত' না-ই চাচি, থাম্কা এই দুষমন দু'টো আমাকে ভুগিয়ে মারছে। দু'টোর একটিও বাঁচবে না, দেখে নিয়ো তুমি। যে ক'দিনের দানা-পানি নিয়ে এসেছে তাই উসুল করে নিচ্ছে আর কি।

—যা। ছাই কপালী! অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনিসনে।

কইতেই কয়—'বেটা নেই যার, পোড়া কপাল তার'। ষাট্, আমার মাথায় যত চুল, তত বছর হায়াত নিয়ে বেঁচে থাক্, নবাব বাদ্‌শা হোক্!

—ভালোই ত' বল্‌ছি চাচি। সমানে দু'মাসও ত' দু'টোর একটাও ভালো থাকে না। জ্বর, কাশি, পেটের অসুখ লেগেই আছে। একটা একটু সেরে' ওঠে, আর একটা পড়ে। কি বল্‌ব চাচি, জ্বালিয়ে একেবারে অঙ্গার করে' ফেল্‌লে আমাকে। একটু ফুরসৎ দেয় না—এমন কাঁদুনে খুঁত্‌খুতে—

ওসমানের মা একটু হাস্‌লেন। সহানুভূতির হাসি।

ফালি আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—আর আমাদের বংশে কেন জানি ছেলে-পুলে বাঁচে না। মা বল্‌তেন—'তোর জন্মের আগে তোর আরো দু'বোন হয়েছিল, তারা আতুড় ঘরেই দুধ-ছেড়ে মরে গেল। তুই যখন হ'লি তখন তোর বড়মা ছিলেন বেঁচে। তোর জন্মের দু'কুড়ি দিনের দিন, তোকে কোলে করে' নিয়ে তিনি ফেলে দিয়ে এলেন মস্‌জিদের বারান্দায়, আল্লার নামে। তারপর তোর চাচা তোকে তুলে এনে নাম রাখ্‌লেন ফালানী।' সত্যিই চাচি, আমাদের বংশের কেউ বাঁচ্‌লও না। এই মা'র দিক্‌টাই ধরো, আমার মায়েরা ভাইয়ে-বোনে ছিলেন—তিন, আর ওদিকে চার—আর হালিমা-খালা। এই মোট ক'জন হ'লো, চাচি?

আগামীবারে সমাপ্য

ওস্‌মানের মা হেসে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন—মর্‌ আবাগি, তা'ও বল্‌তে পারিস্‌নে। মোট আটজন ত হ'ল!

সুমুখের ভাঙ্গা পাঁচিলটা ডিঙিয়ে ফালির চোখের দৃষ্টি তখন বহুদূর চলে গিয়েছিল। ওস্‌মানের মা'র কথায় দৃষ্টি টেনে নিয়ে বল্‌ল—হ্যা, ঠিক। এই আটজন ছিলেন। চার বোন, চার ভাই। একে একে সব ক'জনই গেলেন। এদিকে আবার, আমার বাবার বড় ছিলেন একজন, আর ছোট ছিলেন একজন, এই তিন ভাই ছিলেন তাঁরা। বড়জন সবার আগেই গেলেন। ছোটজনের ছিল মাথা খারাপ, সেই যে একদিন রাত্তিরে ঘর থেকে কোথায় বেরিয়ে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। তারপর, আমি যখন ন' বছরেরটি তখন বাপ গেলেন মারা আমার ছোট ভাই ছিল তিনটি, ফিরে বছর তারাও গেল ওলাওঠায়।

বল্‌তে বল্‌তে ফালি হঠাৎ চুপ করে' রইল। তার উদাস চোখ দুটি তখন ছল্‌ ছল্‌ করে উঠেছে।

পরে গলা পরিষ্কার করে বল্‌ল—তারপর, বুঝ্‌লে চাচি?

ওস্‌মানের মা তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন বুঝি! ফালির ডাকে হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠ্‌লেন।

স্নেহার্দ্র দু'টি চোখ তুলে ফালির মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—আজ তুমি, কাল আমি, এমনি আগে পরে সকলকেই

একদিন মরতে হবে, মা। যারা চলে গেছেন তাঁদের জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। যারা আছে, তাদের নিয়ে যত্ন করো, হাসো, কাঁদো তবু তোমার শান্তি, তাদের মুখের দিকে চেয়েও সুখ পাবে।

নিস্তেজ দু'টি চোখের দুয়ারে গভীর তন্ময়তা নিয়ে ফালি ওই ভাঙ্গা দেয়ালটার দিকেই নির্জ্জীবের মতো চেয়ে রইল। যেন চোখের সামনে স্মৃতির-শবযাত্রা! তার খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা দেখা যায় না। বহু দূর-ব্যাপী দীর্ঘ,—আর ধোঁয়াটে, ধূসর!

ওস্‌মানের মা বলতে লাগ্‌লেন—এই ওস্‌মানকে এক বছরের রেখে ওর বাপ্‌ যখন এই পাপ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তখন এক ওস্‌মানের ফুফু ছাড়া মাথার ওপর মুরব্বি বল্‌তে কেউ ছিলেন না। তখনো, এত বড় একটা শোকের মধ্যেও ওস্‌মানের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটিয়েছি। মর্‌বার কালে ওস্‌মানের বাপ্‌ বলে গেছ্‌লেন—'আমি ত' চল্‌লুম, কিন্তু ছেলে যদি আমার বেঁচে থাকে, তবে ঘর-দোর বিক্রী করেও ওকে মানুষ করো, লেখা-পড়া শিখিয়ো, ও বেঁচে থাক্‌লে আমার বংশের নাম থাক্‌বে।'—একটু জিরিয়ে নিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন —তা' আমি যতটুকু পেরেছি, ওস্‌মানকে করেছি। একটা 'পাশ'ও করেছিল, কিন্তু কলেজে আর ভর্ত্তি করাতে পার্‌লুম

না। বাড়ীটা ছিল রেহান, নীলামে উঠে গেল। হাতে-পাতে যা' ছিল তা'ও গেল ফুরিয়ে। তাই নিরুপায় হয়ে যাদু আমার ছ' মাস ধরে চাকুরীর খোঁজ করে' করে' কত খানেই না ঘুরল। এই ত মাস দুই হয় বিড়ীর ফ্যাক্টরীতে লেগেছে। তাই বলছি মা, এই সুখ আর শোক জড়ানো জীবনকে যখন বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, তখন মরণের দোহাই দিলে ত খালি চলবে না। মরা-বাঁচা সব খোদার হাতে। এমন সোনার চাঁদ! দেখে বুক ঠাণ্ডা, বড় হয়ে উঠলে তোর ভাত পরে খাবে। বুঝবি মা, বেঁচে থাকলে এই দুষমন দু'টোই একদিন কি কাজে লাগে—বুঝবি।

ফালি তখনো মনে মনে নিজের কথারই জের টানছিল। সে যেন নিজের মনেই বলে উঠল—সব গিয়েও মা'টি বেঁচে ছিলেন, কিন্তু খোদার কি মর্জ্জি আমার বিয়ের বছরেই মা'ও আমায় ছেড়ে চলে গেলেন।—এবার ফালির কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক হয়ে উঠল।—আমার আর কোন কিছুই রইল না, চাচি! বাপ্-দাদার ভিটেটুকু ছিল, তাও-ও দিলে নেশা করে' করে' উড়িয়ে। তারপর আমাকে এখানে এনে—

ফালি আর বলতে পারল না। চোখ ফেটে জলের ধারা নামল।

আগামীবারে সমাপ্য

ওসমানের মায়ের মুখেও কোন কথা নেই। এই স্বল্প সময়ের ফাঁকে দু'জনেরই ভাষা যেন অতর্কিতে হারিয়ে গেছে।

বহুক্ষণ পর ফালি যখন উঠে চলে গেল, তখন আকাশে মেঘ জমে ঘন হয়ে উঠেছে।

ওস্‌মানের জীবনের কোলাহল যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সেদিন ঘরে পা দিয়েই বলে—তুমি বিড়ী বানাতে পার্‌বে মা?

আজকাল ওস্‌মানের প্রশ্নে মা একটু থতমত খেয়ে যান। প্রশ্ন অস্বাভাবিক বলে' নয়, হেতু অজ্ঞাত বলে' নয়, শুধু ওর কথায় স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, তাই।

মা মমতার স্বরে জবাব দেন—পার্‌ব না কেন, তুই দেখিয়ে দিস্‌।

খুসীতে ওস্‌মানের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে—আচ্ছা রাখো, আমি কালই সব আন্‌ছি।—পাতা, সুখা, সুতো।—ওহ্‌ ভারি চমৎকার হবে, ঢের লাভ।

একটু দম নিয়ে বলে—বুঝ্‌লে মা, বানাতে পারলে তুমি একাই রোজ কত মুনাফা পাও দেখে নিয়ো। ভালো সুখা দিলে বাসায় বসেই বিক্রী—টাকা টাকা হাজার।

—বেশ্‌ত,' এনে দিস্‌ না। বসেই ত থাকি।

উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় ওস্‌মানের মন তাজা হয়ে ওঠে। বলে —উমেশের মুখ-পোড়া বিড়ীর সুতো কালো। আমি দেব সবুজ, কি বল মা?

—তাই দিস্‌, খুব সুন্দর হবে।

ওস্‌মান যেন মস্তবড় মার্চ্চেণ্ট্‌। বলে—আমাদের বিড়ীর একটা ভালো নাম রাখতে হবে। তুমি একটা নাম বল দিকিন্‌ মা, কেমন—

মা এবার হেসে ওঠেন। বলেন—রেখেদিস্‌ লাট সাহেবের বিড়ী—

ওস্‌মান ত' হেসেই লুটোপুটি। বলে—'লাটসাহেবের বিড়ী' আবার নাম হয় নাকি?—ছাই নাম! তবে আর বিক্রী হবে কি?

খানিক চুপ থেকে পরে হেসে বলে—আমি মনে মনে একটা ঠিক করেছি, চমৎকার নাম। বেশ মানান সই—আধুনিক গোছের—

মা জুড়ে দেন—তবে বুঝি নবাবী বিড়ী—

—ধ্যেৎ! ও সব ত নামই না।

—তবে কি?

ওস্‌মান বহুদর্শী ব্যবসায়ীর মতো জবাব দেয়—আমাদের

আগামীবারে সমাপ্য

বিড়ীর নাম হবে 'স্বাধীন-ভারত'। কেমন? ভালো নাম হলো কি না?

মা সস্নেহে হেসে বলেন—বাঃ! সুন্দর নাম ত'। বাবার আমার বুদ্ধি আছে—খোদা হায়াত দারাজ্ করুন!

উৎসাহে ওস্মানের বুক ফুলে' ওঠে।

এরি ফাঁকে সে মনে মনে ভবিষ্যতের খস্ড়াটা তৈরী করে' ফেলে। মা ঘরে বিড়ী বানাবেন—সে উমেশের ওখানে কাজ করবে। দু'দিকের আয় দিয়ে কালে নিজেই মস্তবড় ফ্যাক্টরী খুলে বস্বে। বাজারে তার বিড়ীর সুনাম ছড়িয়ে পড়্বে—তারপর, বাড়ী-ঘর থেকে আরম্ভ করে—টাকা-পয়সা, জিনিষ-পত্র, লোক-জন, একটা রাঙা-বৌ পর্য্যন্ত।

এমনি কত রকম কল্পনা তার মাথায় বাসা বাঁধে।

হঠাৎ আনন্দের একটি স্রোত-ধারা কোথায় যেন বাধা পেয়ে থেমে গেল। মা বলে উঠ্লেন—আমাদের ত' আর এ বাসায় থাকা চল্বে না বাবা।

—কেন? বাড়ীওয়ালা কিছু বলেছেন নাকি?

—না বাবা, বল্বেন কি? ভাড়া দিতে না পার্লে—

অকস্মাৎ মা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্লেন। তারপর কথার মোড় ঘুরিয়ে বল্লেন—তা' ছাড়া এ বাড়ীতে নাকি বাড়ীওয়ালার কোন এক আত্মীয় আস্ছেন। আগামী মাসেই—

আগামীবারে সমাপ্য

ওস্‌মানের প্রবল উৎসাহ কম্‌বার নয়। বল্‌ল—আসুক না যার ইচ্ছে। ওঁর টাকা এ মাসেই শোধ করে উঠে যাব।—উমেশকে ত আগেই বলে রেখেছি।

—উমেশ অগ্রিম দিতে রাজী হয়েছে?

—হবেনা কেন, মাগ্‌না নাকি—এখন আমার যে চালু-হাত। আর অতিরিক্ত সময়ের মজুরী তো জম্‌ছেই ওর কাছে।

কি জানি কেন ওস্‌মানের মুখের দিকে চেয়ে এক অকথিত ব্যথায় মা বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌লেন। হাজার হ'লেও ত' পেটের ছেলে। তার এই অপরিণত বয়সের স্বভাব-সুলভ সারল্যকে সংসারের কঠোর চাপে মেরে ফেল্‌তে মা'র অন্তরটা একটি গুপ্ত অঙ্কুশের আঘাতের মতোই কচ্‌ কচ্‌ করে উঠ্‌ল।

কিন্তু কর্‌বে কি!

ওঁর ওস্‌মান যে ঝড়ের-রাতের মাঝি—সহস্র ঝড় তুফানেও তাকে পাড়ি দিতে হবে।

সেদিন রাত্রে মাতা-পুত্রে কত কথাই হয়। অসংখ্য স্বপ্নের, অগুন্তি আশার, অগণন দীর্ঘশ্বাসের।

মাঝে মাঝে ওস্‌মানটা একদম্‌ অবুঝ হয়ে ওঠে। কতকালের

হারানো ঘুমন্ত স্মৃতিকে খোঁচিয়ে খোঁচিয়ে জাগিয়ে তুলে। বলে—বলো না মা, তারপর কি হলো বাবার—

—তারপর, চলে গেলেন তোর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে। তিনি এমন নেক্‌বখ্‌ত ছিলেন, মুখটা আপ্‌না থেকেই পশ্চিম মুখো হয়ে গেল—এতদিন রোগে ভুগেও চেহারা একটুও বিকৃত হয়নি। কাফন পরে' যেন হাস্‌ছিলেন।

এসব কথা ওস্‌মান আরো কতদিন শুনেছে, তবু তার এই নিষ্ঠুর ঔৎসুক্যের বিরাম নেই।

—আচ্ছা মা, আজ যদি বাবা বেঁচে থাক্‌তেন তবে কি সুখটাই না হ'ত আমাদের, না? আমাকে হয়ত কলেজে ভর্ত্তি করে' দিতেন। হয়ত আমরা এতদিনে মস্ত বড় লোক হয়ে যেতুম। তোমাকেও হয়ত এত দুঃখ পেতে হতো না।—একটু দম দিয়ে বলে—আমার যদি আর একটি ভাই থাক্‌তো মা,—তা' হ'লে দু'জনে মিলে কত টাকা রোজগার করে' ফেল্‌তুম—

ওর মাকে নিরুত্তর দেখে ওস্‌মান নিজেই বলে—বাবা বুঝি খুব বই পড়্‌তেন, মা!

—বই ছিল ওঁর সঙ্গী।—বলেই মা একটি উদ্গত নিঃশ্বাস চাপা দিয়ে রাখেন।

—তারপর মা?

আগামীবারে সমাপ্য

মায়ের বুকের ভেতর তখন ঝড় বইছে।

তিনি ধমকে ওঠেন—তারপর আবার কী? কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড় এখন।

ওস্মান একবার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তারপর চোখ বুঝে মনে মনে কি যেন ভাবে। ভাবতে ভাবতে কোন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

তখন অনেক রাত হয়ে গেছে।

রান্না ঘর থেকে বিড়াল দু'টির মারামারি আর চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। হয়ত ইলিশ্ মাছের টুক্‌রো নিয়ে। মা তাড়াতাড়ি পাখাটা হাতে করে' বেরিয়ে আসেন।

সারাদিন কেঁদে কেঁদে আকাশের বুক যেন হাল্‌কা হয়ে গেছে। কী প্রশান্তিপূর্ণ শান্তশ্রী। কী এক অস্ফুট বেদনায় থেকে থেকে তারাগুলো শুধু কাঁপে। বহু দূরে আকাশের একপ্রান্তে অসীম অন্ধকারের অবগুণ্ঠন চিরে তখন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে।

পেছনের মাটকোঠা থেকে শ্রুতিকটু কণ্ঠস্বর কাণে এসে লাগ্‌ছিল। ওস্মানের মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়েই উঠানে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন।

তাই ত! এ যে ফালির স্বামী বদ্রুর কণ্ঠস্বর। স্বামী-স্ত্রীর ঠোকাঠুকি। কিন্তু এ লোকটা কী প্রাণহীন, কী আত্মস্বার্থপরায়ন।

অসহিষ্ণু লোলুপতার চাপে ওর হৃদয় যেন কুঞ্চিত হয়ে মরে গেছে। নইলে ঘরে এমন দু'টো মানিক ফেলে এমন সৃষ্টিছাড়া কাজ কর্‌তে পার্‌ত না। কিন্তু পারাটাই এ শ্রেণীর মানুষ-গুলোর স্বভাব। মানুষের এই নির্লজ্জ নীচতা, প্রবৃত্তির এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা মনে করে' ওস্‌মানের মায়ের অন্তরাত্মা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে।

বিয়ের পর থেকেই ফালির কপালে আর সুখ হ'ল না। ছোট ছেলেটা হ'বার পরই নবাব গঞ্জে গিয়ে বদ্‌রু কবুল আর একটা নেকাহ্‌। কিন্তু তা' হলেও ফালির এত দুঃখ হ'ত না—যদি পেটের জ্বালা নিবৃত্তির উপায় থাক্‌ত। সেই নেকাহ্‌র পর থেকেই বদ্‌রুর নাগাল পাওয়া যায় না। মাস-দু'মাস পর যখন খুসী একদিন এসে হাজির হয়। কিন্তু এই তিনটি প্রাণী যে কেমন করে' দিন কাটায়, কেমন করে' সংসার চলে, কোথা দিয়ে আসে তেল্‌-লবণ, কেমন করে চড়ে উনুনে হাঁড়ি, সে সব বদ্‌রুর মনে পড়ে না। তার খোঁজ নেবার কোনো প্রয়োজনই যেন নেই। এ সংসারের সাথে তার যেন কোনো কিছু সম্বন্ধ নেই। আছে শুধু একটু রসিকতা কর্‌বার ছুতো, একটু ফাজ্‌লামো কর্‌বার অজুহাত। হয়ত একটা হীন কুৎসিৎ সম্বন্ধের কাছে দু'দণ্ডের আত্মীয়তা। হয়ত বা একটা সৌখিন খেয়াল। হয়ত তাই—

আগামীবারে সমাপ্য

কিন্তু এই তিনটি জীবন না খেতে পেয়ে মরে' যাক্—তাতে বদ্রুর বড় বয়ে গেছে আর কি!

কতদিন হয়ত ফালি মৃদুকণ্ঠে বলেছে—ওগো, শুন্‌ছ? ঘরে চা'ল-ডা'ল কিছু নেই। কেমন করে আমি চলি, বলো ত? ছেলে দুটোর দিকে দেখেও কি তোমার একটু মায়া হয় না? ছ্যাখো দিকিন্, তাদের অবস্থাটা একবার!

বদ্রু জবাব দিয়েছে—হবে, হবে, এই তো ব্যবস্থা কচ্ছি। কোনদিন হয়ত নেশার ঝোঁকে ফালির তোব্‌ড়ানো মুখের ওপর একটু সোহাগ করেছে। কোনদিন হয়ত মাটীর দেয়ালের সাথে ওর মাথাটা ঠুকে দিয়ে বলেছে—গতর খাটিয়ে, খেটে খেতে পারিস্‌নে?

কিন্তু বিড়াল দু'টোর আজ হ'ল কি? দ্বন্দ্বযুদ্ধ যেন আর থাম্‌তেই চায় না। রাত্রির এই আবরণটাকে খামচে, কাম্‌ড়ে, টেনে, ছিঁড়ে একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেল্‌তে চায় যেন।

তখনো ফালির এই গোঁয়ার মাতাল স্বামীটার গলাবাজি শোনা যাচ্ছিল। কি একটা কথা নিয়ে সে জেদ কর্‌তে থাকে।

ফালি মৃদু প্রতিবাদ করেন বলে—কেন, রাত দুপুরে এসে আমার কাছে এত দাবী খাটানো কেন? আমি তোমার কে? তোমার ভাত খাই, না কাপড় পরি?

বদরু তেড়িয়ে হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে বলে—কেন? এত দেমাগ তোর কী জন্যে লো হারামজাদি? রাখ্, মজা তোর বার কচ্ছি! কালই—।—বলেই একটু কি ভেবে নিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে—ওই বাড়ীর ছোঁড়ার সাথে তোর কিসের আলাপ, শুনি?

ফালি আঁৎকে ওঠে—কার সাথে আবার আলাপ কর্‌তে গেলাম?

—আমি জানিনে? আমার কাছে লুকোচুরি? কার চোখে ক'টা শিরা আছে তা' পর্য্যন্ত গুণে বল্‌তে পারি। তুই বদরুকে আহাম্মুক ঠাওরাস্‌নে বুঝ্‌লি? অত সোজা নয়।—হ্যা, কি জানি, নামটা—ওস্‌মান, না হ্যাংলা—হ্যা, ওস্‌মানই!

কথাগুলো স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল। ওস্‌মানের মা'র গা'টা এবার কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ফালি কাতর কণ্ঠে বলে—ছি, ছি! এ তুমি কি সব যা' তা' বল্‌ছ। ওরা শুন্‌লে কি মনে কর্‌বে বলো ত?

—কর্‌বে আবার কি? ভাব কর্‌তে গেলে অমন একটু আধটু মনেও কর্‌বে বৈ-কি! তুই ছেনালিপনা কর্‌তে পারিস্, আর আমি কি একটু বল্‌তেও পারিনে?

এরপর ফালি আর কিছু বল্‌তে পারে না। ওর নারীত্ব ব্যথিয়ে ওঠে, মাতৃত্ব সাড়া দেয়।

বদ্রু জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—বল্ দিকিন্, বল্, তোর ওই মিট্‌মিটে চোখ দু'টোতে হাত দিয়ে বল্ দিকিন্, সত্যিই কিনা ? ওই ছোঁড়ার সাথে তোর—

ফালি নিস্পন্দ হয়ে চেয়ে থাকে। ওর ছোট্ট ছোট্ট চোখ দু'টি যেন কোটরের ভেতর ঢুকে মরে গেছে। একবারে নিষ্প্রভ নিস্তেজ দৃষ্টি।

বদ্রু ফের আরম্ভ করে—জানিরে, আমি সবই জানি, কখন ছোঁড়ার কাঁধে হাত রেখে প্রেম কচ্ছিলি তাও জানি। খালি আমি একা জান্‌ব কেন, পাড়ার আরো দু'দশ জনেও জানে। ওই বাড়ীরই বাড়ীওয়ালা পর্য্যন্ত। তাগাদা কর্‌তে গিয়ে ত' সে নিজ চোখে দেখে এসেছে—তোর কাণ্ড। বেচারী আপন লোক বলে' কথাটা আমার কাছে গোপন রাখ্‌লে না। বললে—'বুঝ্‌লি, ভাগ্‌নে! তোর এই বৌটাকে একটু সাবধান করে দিস্—গেরস্থ পাড়ায় এ সব ঢলাঢলি কাণ্ড চল্‌বে না বাপু। শুধু তুই বলে সয়ে গেলুম।' কেমন, এখন বুঝ্‌লি ত'? তা' লুকোস্ কেন? বল্, আজকে গেছ্‌লি কি না ?

ফালি আর চুপ্ করে' থাক্‌তে পারে না। মরিয়া হয়ে ওঠে। বলে—খুব করেছি, আরো করব। যারা আমার জীবন রক্ষা কচ্ছে তাদের নামে যত সব মিথ্যে কারসাজি। যাবই ত!

—একটা ঢোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বলে—যাবে না, কি জানি কর্‌বে।

বদরু ক্ষেপে উঠে দাঁত কড়্‌মড়িয়ে বলে—কি বল্‌লি? রাখ্, মাগী। বড় বেড়ে গেছিস্ তুই!

ভয়ে ফালির বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে ওঠে।

তারপর আর কথা শোনা যায় না। যায় শুধু দুম্‌দাম শব্দ, আর অস্ফুট তড়্‌পানি।

পরদিন সকালে ভাঙ্গা দেয়ালটার কাছে দাঁড়িয়ে ওস্‌মানের মা ডাক্‌লেন—ফালি, ফালি আছিস্ নাকিরে?

—হ্যা চাচি। আস্‌ছি—

সেই শীর্ণ হাড় ক'খানার ভেতর থেকে একটা জরাজীর্ণ ক্ষুধার্ত্ত কাঙাল যেন উঁকি মেরে উঠ্‌ল। ওর মুখের জায়গায় জায়গায় কেটে ফুলে' নীল হয়ে গেছে।

ওস্‌মানের মা বল্‌লেন—ঘরে কে?

ফালি বল্‌ল—কেউ না। রাত্তিরে ও এসেছিল, ভোরে চলে গেছে।

ওস্‌মানের মা ও কথায় কাণ দিলেন না। যেন এসমস্ত

তিনি কিছুই জানেন না। কি একটু ভেবে নিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—আজ থেকে আর আমাদের বাড়ী আসিস্‌নে, বুঝলি?

ফালি বিস্ময়াবিষ্ট দু'টি চোখ তুলে ওঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারপর মাথা নেড়ে উত্তর দিল—আচ্ছা!

আর কোন কথাই হ'ল না। কিন্তু আড়ালে এসে ওস্‌মানের মা আঁচলে চোখ মুছ্‌ল।

যেদিন ওস্‌মান তার মাকে সঙ্গে করে' ওয়াটার ওয়ার্কস্‌ রোডে উঠে এল। সেদিন সে বুড়ো বাড়ীওয়ালার ট্যারা চোখ দু'টি মমতায় ভিজে উঠেছিল বৈ-কি।

মা বলেন—বাসাটা একটু বড় হয়ে গেছে ওস্‌মান, ভাড়া ত' বেশী লাগ্‌বে। একটুখানি সংসার—

ওস্‌মান তেমনি হেসে বলে—তা' ভয় কি? বাইরের বড় কোঠায় বিড়ীর ফ্যাক্টরী খুলে দেব। আর এইটুকুন্‌ জায়গা না হ'লে ভদ্দলোক থাক্‌তে পারে?

মা একটু টিপ্পনি দিয়েই বলেন—ওরে বাপ্‌রে! ভারি আমার ভদ্দলোক। টাকা নেই, পয়সা নেই, ভারি ত'—আবার ফ্যাক্টরী খুল্‌বেন তিনি।

ওস্‌মান প্রবল আপত্তি করে' ওঠে—কী! ফ্যাক্টরী খুল্‌তে পার্‌ব না? বাজী রাখো! আল্‌বৎ পার্‌ব, দেখে নিয়ো।

মা আর কোন্‌ জবাব দিতে পারেন না।

আগামীবারে সমাপ্য

স্নেহ-সিক্ত দু'টি চোখ তুলে ওস্‌মানের মুখের দিকে চেয়ে কথা শুনতেই যেন ভালো লাগে মা'র।

দিন যায়, মাস ফুরোয়, বছর ঘুরে আসে।

কিন্তু ওস্‌মানের কথা নড়চড় হয় না।

রাস্তার ধারে সেই একতলা দালানটার কপালে হঠাৎ একদিন 'স্বাধীন-ভারত বিড়ী ফ্যাক্টরী' লেখা টিনের লম্বা সাইনবোর্ড খানা রাক্ষসের মতো হা করে' চেয়ে থাকে।

ওস্‌মান হেসে বলে—দেখ্‌লে মা, দেখ্‌লে ত এখন? ফ্যাক্টরী খুলে দিলুম কিনা?

এক অনাস্বাদিত আনন্দে মা'র বুকের ভেতর কান্না ফেনিয়ে ওঠে।

ওস্‌মান আবার বলে—কাল থেকে আরো ক'জন কারিকর আস্‌বে। পাতা আর সুখা সব উমেশই সাপ্লাই কর্‌বে।

মা বলেন—হঠাৎ উমেশের কাজটা ছেড়ে দিয়ে এলি, উমেশ কিছু মনে কর্‌বে না-ত'?

—না না, ও আরো খুসী হয়েছে, মা। বলেছে—'তুমি যদি স্বাধীন হয়ে জীবনে কোন কিছু করে' উঠ্‌তে পারো ওস্‌মান,—তবে সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হব আমি।'

আগামীবারে সমাপ্য

—বেশ, কিন্তু যেমন হাত দিয়েছিস্ বাপ, তেমনি সবদিক গুছিয়ে, ভেবে-চিন্তে কাজ করিস্।—বলে ওস্মানের মুখের দিকে চেয়ে মা হঠাৎ বলে ওঠেন—খিদেয় মুখ ত' শুকিয়ে আছে তোর। ভাত হয়ে গেছে, খাবি আয়—

মা'র পিছু পিছু ওস্মানও রান্না ঘরে ঢুকে পড়ে' তারপর।

এ বাড়ীতে আসা অবধি ওস্মানের মনটা কেমন যেন একটু ইন্দ্রিকরা ভাবের হয়ে গেছে। মনে হয়, এ জায়গার সবই যেন সুন্দর। ধান পুকুরের সেই এঁদো গলিরটার মতো নয়। এখানকার আকাশ যেন সীমাহীন, অফুরন্ত। আশ্পাশের মানুষ-গুলোও যেন একটু স্বতন্ত্র।

পাশের বাড়ীর মেয়েরা আসে, ওপাশের নতুন ভাড়াটের সাথে দেখা হয়। ধীরে ধীরে পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। তারপর মৌখিক আত্মীয়তা, সস্তা বন্ধুত্ব। তারপর,—অবান্তরতায়, তুচ্ছতায়, অগুন্তি আশায় জড়িয়ে জীবনের পুনরাবৃত্তি চলে।

এমনি দিন যায়।

ফ্যাক্টরীতে বসে বসে ওস্মান সবই দেখে, সবই শোনে। এদিকে কান্না, ওদিকে হাসি। এদিকের পুরোণো ফাটল্‌ধরা খালি বাড়ীটা বার্দ্ধক্যের চাপে হাঁপায়, ওদিকের জোয়ান জবরদস্ত বাড়ীটা বুক ঠুকে হাসে।

আগামীবারে সমাপ্য

কিন্তু রাস্তার ওপারে 'স্বাধীন-ভারত বিড়ী ফ্যাক্টরী'র বরাবর সেই দোতলা বাড়ীটা তেমনি খালি পড়ে' থাকে। ভাড়াটে আসে না। যারা আসে তারা বাড়ীটার চরিত্রের পূর্ব্ব-ইতিহাস শুনেই সরে পড়ে। পাড়ার গুজব—কিছুকাল আগে নাকি দু'টি নিপীড়িত-প্রাণ তরুণ-তরুণী এসে এ বাড়ীতে বাসা বেঁধে ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যায়, ওরা দু'জনেই কেমন করে' জানি মরে পাশাপাশি পড়ে' আছে। কিসে মরে ছিল, সে ইতিহাস পুলিসের লোক ছাড়া অন্য কেউ জানে না। হয়ত জান্‌বার প্রয়োজনই করেনি কারুর। সেই হতে অপয়া বলে, এই বাড়ীটার একটু দুর্ণাম আছে।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ সে বাড়ীটায় নূতন ভাড়াটে দেখা যায়। কেউ বলে, বুড়ো হলেও মাষ্টার সাহেবের সাহস আছে। আবার কেউ হয়ত বলে, শিক্ষিত মানুষ এসব কুসংস্কার মান্‌বে কেন?

কথাটা হয়ত একেবারে মিথ্যে নয়। হয়ত সত্যিই।

কিন্তু যার বাড়ী তিনি এই নতুন ভাড়াটে মাষ্টার সাহেবের কাছে বলেন—তবে কথা কি মাষ্টার সাহেব, আমার বাড়ীতে যারা বাস করেছিল, তাদের সবারই কপাল ফেটে গেছে। তবে কি জানেন, ঈমান ঠিক রেখে (অবশ্যি এ বাড়ীতে বাস করে'ই) যা' কামনা কর্‌বেন একেবারে হাথ্-সাক্ষেৎ ফল। কিন্তু মাষ্টার

সাহেব, বেইমানীর দিকে পা একচুল পড়্‌ল ; কি তলিয়ে গেলেন। আপনাদের দোয়ায় এ বাড়ীতে অনেক পীর-ফকীরের কদমের ধুলো পড়েছে কি-না! তাই বাড়ী আমার বেইমানের ছোঁয়া সইতে পারে না। শুনেছেন না আপনারা? সেই-যে সেই মাগী-মদ্দা দু'টোই কেমন করে' রাতারাতি,—আপনারাও শুনে থাকবেন বৈ-কি!

মাষ্টার সাহেব হাসির খাতিরেই হয়ত একটু হাসেন।

ওস্‌মানের ফ্যাক্টরীর কাজ তেমনি স্বচ্ছন্দে চলে।

মনে তেমনি সম্ভাবনার আনন্দ, জীবনকে প্রসারিত কর্‌বার তেমনি রণোল্লাস।

কিন্তু যত মুস্কিল ওই মাষ্টার-বাড়ীর মেয়েটাকে নিয়ে।

মেয়েটি কী! লজ্জা যেন ওর কাছে বিদায় নিয়েছে। যেমন অশান্ত, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। দোতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃতেই যেন ভালো লাগে ওর।

ওস্‌মানের হয় রাগ। ওর দিকে চেয়ে যে তার কাজের খতিয়ান মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায়।

মুখ ফুটে বল্‌তে পারে না—এমনি উজ্‌বকের মতো চোখ

আগামীবারে সমাপ্য

ছু'টি হা করে কী দেখ্‌ছ! গিলে খাবে নাকি? লজ্জা করে না, বেটাছেলের দিকে এমন করে তাকিয়ে থাক্‌তে?

সেই হ'তে ওস্‌মান ক'দিন আর ফ্যাক্টরীর বারান্দায় বসে না। কিন্তু সেই দোতলা থেকে হাসির অফুরন্ত তরঙ্গ ওর কাণে এসে ধাক্কা লাগে।

ওস্‌মান মনে মনে বলে—এ কেমনতর মেয়েরে বাপু! কত ভঙ্গীতেই না হাস্‌তে জানে।

ক'দিন পর একদিন বিকেলে ফ্যাক্টরীর বারান্দায় বসে, নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই ওস্‌মান চায়ের পিয়ালাটা মুখের কাছে নিতে যাচ্ছিল—হঠাৎ ফস্‌কে এক মুহূর্ত্তে কি যে হয়ে গেল—

—ধ্যেৎতেরি, যাঃ!

সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশের রেলিং থেকে একটা অদ্ভুত হাসির ঝঙ্কার ঝরে পড়্‌ল।

ওস্‌মান নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে সেখান থেকে উঠে গেল। ভেতরে এসে লজ্জায় ও রাগে সে যেন কেমন এক রকম হয়ে পায়চারী করতে সুরু করে' দিল। তারপর অকারনেই হিসাবের খাতাখানা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়্‌ল।

খানিকপর ফিরে এসে বারান্দার টুলটার ওপর আবার বসে পড়্‌ল তেমনি।

আগামীবারে সমাপ্য

কিন্তু কী অদ্ভুত ওই মেয়েটি। এতহাসিও হাস্তে জানে? সেই কখন চায়ের কাপ্টা পড়ে গেছে—তাই নিয়ে এখনও—ছিঃ—

আহ্লাদের আতিশয্যে ও যেন ফেটে টুক্রো টুক্রো হয়ে যেতে চায়।

ওস্মানের কাছে মেয়েটি যেন একটি দুর্বোধ্য ব্যাকরণ। বার বার পড়েও সহজে কিছু বোঝা যায় না।

মেয়েটির নাম নাকি সুফিয়া। বয়স সতেরো কি আঠারোর কোঠা ধর্‌ধর্‌। দেখ্তেও বেশ! বড় বড় হরফে ডবল কলাম হেডিংএ ছাপা একখানি বায়স্কোপের বিজ্ঞাপন যেন। দেখলেই নজরে ধরে।

সে দিনটা বোধকরি রবিবার।

দুপুর বেলা ওস্মান ঘরের ভেতর উপুড় হয়ে শুয়ে কি একখানা মাসিকের পাতা উলটে যাচ্ছে—এমন সময় দক্ষিণের খোলা জানালাটার কাছে সুফিয়া এসে দাঁড়াল। যেন বর্ষণ-ক্ষান্ত মেঘের আড়াল থেকে জানালাটার ওপর এসে পড়্‌ল—এক ঝল্‌ক সোণালী-রোদ।

আগামীবারে সমাপ্য

হঠাৎ ওস্‌মানের নজর পড়্‌তেই—মুহূর্ত্তের জন্য জড়সর হয়ে সুফিয়া বল্‌ল—এই আপনাদের বাড়ী বেড়াতে এলুম।

সেদিনের নির্লজ্জতায় সুফিয়ার বিরুদ্ধে ওর সমস্ত মন যেন বিদ্রোহ করেছে।

বইয়ের ওপর নজর রেখেই জবাব দিল—বেশ ত—

তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে বল্‌ল—মা ওই ঘরে আছেন।

সুফিয়া চল্‌তে সুরু করে।

ওস্‌মান অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। মনে হয়, মেয়েটির কোথায় যেন একটি রহস্য আছে।

সেদিনও তেমনি।

—আপনি খুব বই পড়েন দেখ্‌ছি। আমায় একটা বই দিন্ না, পড়ে ফেরত দেব।—সুফিয়া হেসে বল্‌ল।

ওসমান বল্‌ল—আচ্ছা, কিন্তু এখন ত' দিতে পার্‌ছিনে—আর একদিন এসে নিয়ে যেয়ো।

পরদিন আবার।

মুখে সেই হাসি।

—আপনার আম্মার অসুখ, তাই এলুম দেখ্‌তে।

এ যেন তার নাটুকেপনা।

ওস্‌মানের হাসি পায় ফোঁস্ করে বলে ওঠে—মা'র অসুখ হলেই বুঝি আসা?—আর এম্‌নি আস্‌তে নেই বুঝি?

আগামীবারে সমাপ্য

সুফিয়া কোন জবাব দেয় না। হাস্‌তে হাস্‌তে মা'র ঘরে ঢুকে পড়ে।

ওস্‌মানের মনে আজ যেন বন্ধুত্বের ছোঁয়া লেগেছে। ভাবে ঃ

তার এই সর্ব্বহারা জীবনে কত লোকের সাথেই ত' দেখা হয়েছে। কিন্তু সুফিয়ার মতো এমন একটি দরদী মানুষের সাথে কোনদিনই যেন পরিচয় ঘটেনি।

খুসীতে ওর মন ভরে ওঠে।

ব্যাপার এমনি এগিয়ে যায়।

কি জানি কেন আজকাল অনেক সময় সুফিয়ার কথা ওস্‌মানের মনে পড়ে। সুফিয়াকে খুসী কর্‌বার জন্য ওর মনটা যেন নানা অবলম্বন খুঁজে বেড়ায়।

সেদিন সকাল বেলা লাইব্রেরী থেকে ওস্‌মান দু'টি বই কিনে নিয়ে আসে। তারি উপহার পৃষ্ঠায় সবুজ কালিতে সুন্দর করে লিখে যায় ঃ

'ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ—সুফিয়াকে প্রদত্ত হইল।—ওস্‌মান।'

কিন্তু পড়্‌তে গিয়ে সরমে এতটুকু হয়ে যায়। যেন সে

লেখাগুলোর প্রত্যেকটি অক্ষর মুখ ভ্যাঙ্চে ওর এই নির্লজ্জতায় বিদ্রূপ করে।

কি জানি কেটে দিলে পাছে সুফিয়া কিছু সন্দেহ করে' বসে। তাই ভেবে পরক্ষণেই সে লেখাগুলোকে ঢেকে ফেল্বার একটা ফন্দি মাথায় খেলে। এক খণ্ড সাদা কাগজে আঠা লাগিয়ে সে লেখাগুলোর ওপর চেপে দেয়।

তখনও বেলা নিভেনি।

ঠিক এমনি সময় সুফিয়া এসে হাজির। ওস্মান যেন ওরই অপেক্ষায় বসেছিল এতক্ষণ।

আপনার মাসিক পত্রখানা ফেরৎ দিতে এলুম।

আজকাল ওস্মানের মুখে যেন আর কিছুই বাধে না। ওর জীবনের মাধুর্য্য-সিন্ধু যেন সুফিয়ার ছোঁয়ায় আবিষ্কার হয়ে গেছে। বলে—কেন? ওই এক বাঁধা গত্ কেন—সোজাসুজি বল্লেই হয় যে,—আপনাকে দেখতে এলুম।

সুফিয়া দম্বার পাত্রী নয়। দৃঢ়ভাবে জবাব চালায়—কেন, আপনার এমন কি রোগ ধরেছে যে, আমি দেখ্তে আস্ব?

—ওঃ, তাই নাকি? কথা জান তা' হ'লে তুমি?

সুফিয়া কোন জবাব দেয় না। একটুখানি মুচ্কে হেসে ওপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটের একটা কোন্ কাম্ড়াতে থাকে।

ওস্‌মান হেসে বলে—আচ্ছা ধর, যদি সত্যি সত্যি আমার এমন কোন অসুখ হয়ে পড়ে, তা' হলে তুমি রোজ এমনি দেখ্‌তে আস্‌বে ?

—সময় করে আস্‌ব বৈ-কি !

ওস্‌মান ভারি খুসী হয়ে ওঠে। একটা আকস্মিক আবেগের বন্যায় যেন ও ভেসে চলে। বলে—আস্‌বে ? না, সত্যিই বলো, আস্‌বে ?

সুফিয়া ত' হেসেই খুন্। বলে—বা-রে! আপনি এখনই ত' আর অসুখে পড়্‌লেন না ? পড়্‌লে না হয় দেখা যাবে।

—কি, চল্‌লে যে ? এই বই দু'টো নিয়ে যাও।—ওস্‌মান বলে।

—দু'টো নিয়ে কি হবে! একটা আগে শেষ করি, তারপর—

—না না! দু'টোই নিতে হবে, তোমার জন্যেই কিনে এনেছি।

—আমার জন্যে আবার কিন্‌তে গেলেন কেন ?

এ কথার উত্তরে কি যে বলা যায়, ওস্‌মান তা' খুঁজে পায় না। বলে—এম্‌নি।

সুফিয়া বের হয়ে পড়ে তারপর।

আগামীবারে সমাপ্য

বাসায় যেয়ে বইয়ের পাতা উল্‌টাতেই সুফিয়ার নজরে পড়্‌ল—চাপা দেওয়া কাগজের ওই অংশটুকুর ওপর।

আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

নতুন কেনা বই—অথচ দু'খানাতেই এক একটা তালি লাগিয়ে দেবার কারণ কি? ইচ্ছে কর্‌ল, ওই খণ্ডকাগজের তলাকার মর্ম্মকাহিনীটুকু জান্‌বার। তালি দেওয়া অংশটুকু জলে ভিজিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে কাগজ খানা তুলে ফেল্‌ল।

হঠাৎ যুগান্তকালের রহস্য যেন ওই টুকরো কাগজ খানার সাথে সাথে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়্‌ল।

সুফিয়া যেন জীবনের মরুপথে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ এক ওয়েসিস্‌ দেখ্‌তে পেয়েছে। বার বার পড়েও সে লেখা হ'তে চোখ ফেরাতে পারে না। যতবার পড়ে ততবারই যেন সবুজ হরফের ফাঁকে ফাঁকে ভেসে ওঠে একখানি প্রশান্ত কমনীয় মুখ।

তারপর সুফিয়ার আর কোন কৈফিয়ৎ নেই, কোন অজুহাত নেই। যখন তখন এসে হাজির।

চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুর। উদাস হাওয়া যেন হাহাকার করে' ফির্‌ছে।

আগামীবারে সমাপ্য

ওস্‌মান আহার সেরে সবেমাত্র বিছানায় লম্বা হয়েছে, এম্‌নি সময় সুফিয়া জানালাটার ফাঁকদিয়ে ওস্‌মানকে এক নজর দেখে নিয়ে, একটা ছোট্ট ঢিল্‌ ছুড়ে মার্‌ল একেবারে ওস্‌মানের বুকের ওপর।

ওস্‌মান ধড়্‌মড়্‌ করে উঠ্‌তেই সুফিয়া তালি বাজিয়ে খিল্‌ খিল্‌ করে' হেসে উঠ্‌ল।

ওস্‌মান গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—ঢিল্‌ কে মার্‌লে?

সুফিয়া ঠোঁট কুঁচ্‌কে হেসে বল্‌ল—জানি না ক'।

—মাথায় লেগে কেটে যেত যদি এখন।

—যেত ত' যেতই।—সুফিয়ার জবাব।

এ যেন ওর অনাহুত আতিশয্য।

—বলি, আস্তে কথা বল্‌তে পার না বুঝি?—মা শুন্‌লে কী মনে কর্‌বেন। এত চেঁচাতেও পার তুমি।—ওস্‌মান বল্‌ল।

উত্তর এল—আমার কথা যদি ভালো না লাগে তবে বল্‌লেই হয়। আমি না হয় আর না আস্‌ব।

অভিমানে ওর দু'চোখ ভারি হয়ে আসল।

—কি চল্‌লে যে? বা-বাঃ, বোস! আমি কি সেই ভেবে বলেছি নাকি?—তুমিও যেমন।—ওস্‌মান হেসে বলেই চকিতে একবার সুফিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। পরে বল্‌ল—

আরে, ছি ছি—একি !—কাঁদছ যে ? তামাসাও বোঝ না তুমি। ঠাট্টা করে' বলেছি বলে কি—ওই যে মা আস্ছেন, চোখ দু'টো মুছে ফেল তাড়াতাড়ি।

সুফিয়া বেরিয়ে গেল তখন।

মা বল্লেন—কি-রে, এখনও বসে আছিস্ তুই !—এমন কর্লে ত ভালো করেই চালাবি ফ্যাক্টরী।

ওস্মান সন্ত্রস্ত হয়ে বল্ল—এই ত' যাচ্ছি মা।—তারপর চল্তে চল্তে বল্ল—মাথাটা একটু চিন্ চিন্ কর্ছিল কিনা তাই—

মা পেছন থেকে হাঁক্লেন—শোন্, ওই ওস্মান !

কি জানি কেন ওস্মানের বুকটা তোলপাড় করে' উঠ্ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্ল—কি মা ?

—বলি, ঘরে যে এতগুলো বিড়ী জমে আছে—অম্নি থাক্বে নাকি ? এ-গুলো পাইকারদের দিয়ে আস্তে হবে না ?

—অর্ডার সব লিখে রেখেছি মা, কাল অর্ডার মতো যার যা' দোকানে পাঠিয়ে দেব।—ওসমান তাড়াতাড়ি কথাটা কোনমতে শেষ করেই বেরিয়ে পড়ল।

ফ্যাক্টরীতে বসে ওস্মান ভাবতে লাগল :

সে যেন দিন দিন কেমন এক রকম হয়ে পথ ভুলে

আগামীবারে সমাপ্য

যাচ্ছে। কৈশোর থেকে স্বপ্নের-অঞ্জন পরে' যে নীড়-রচনার আশায় সে পথ নিয়েছিল—আজ যেন সে পথের কোন চিহ্ন নেই, কোন শৃঙ্খলা নেই, শুধু এলোমেলো ভাব। সে পথে এই প্রাচীন পৃথিবীর নিঃশব্দ সঙ্গীত যেন থেমে গেছে।

সকাল হ'তে না হ'তেই এ পাশের উকীল বাড়ীতে লোকজনের হাঁক্-ডাক সুরু হ'য়ে গেল।

স্বয়ং উকীল গিন্নী এসে ব'লে গেলেন—দশটি না পাঁচটি, তাঁর একটি মাত্র মেয়ে, সুতরাং ওস্মানের মা যেন নিজের কাজ মনে ক'রেই এই বিয়েতে যান।

ওস্মানকে ডেকে' মা বল্লেন—উকীল-বাড়ীর বিয়েতে যেতে হবে ওস্মান। তোকেও দাওয়াত করেছেন, তুই যাস্ কিন্তু। আমাকে ত' এখনই যেতে হ'ল।

ওস্মান বল্ল—আচ্ছা, যাও।

বিয়েতে আয়োজন যথেষ্টই করা হয়েছিল। বাজীপোড়ান থেকে আরম্ভ করে' খেম্টা নাচ পর্য্যন্ত।

ওস্মান যখন ঘরে আস্ল, তখন অনেক রাত হ'য়ে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো জানালাটা দিয়ে গড়িয়ে ঘরে এসে পড়েছে। যৌবনের ভারে উতলা রজনীগন্ধা তখন থর থর কাঁপ্‌ছে।

আগামীবারে সমাপ্য

ওস্‌মান নিস্তব্ধ ঘরে বিছানায় শু'য়ে চোখ বুজে কি যেন ভাব্‌ছিল। হয়ত খেম্‌টা গানের সুরটা, হয়ত চোখ ফট্‌কানের ভঙ্গীটা, হয়ত বা নূপুরের মিঠা ঝঙ্কারটাই।

এমনি সময় বাইরে অস্ফুট ও কম্প্র একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

—খালাআম্মা আছেন নাকি ?

হঠাৎ ওস্‌মানের বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠল।

লাফিয়ে উঠে কপাট খুলে বল্‌ল—সুফিয়া যে, এসো। মা'ত বিয়ে বাড়ী থেকে এখনো ফেরেন নি।

সুফিয়া যেন কিছুই জানে না। বল্‌ল—ফেরেননি ? ও—

—ওখানে দাঁড়িয়ে যে ? বোস না এসে।

সুফিয়া চৌকিটার এককোনে আল্‌গোছে বসে পড়্‌ল।

কি ভেবে ওস্‌মান সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বল্‌ল—তা' এত রাত্রে মাকে কি মনে করে, তোমার মা কেমন আছেন ?—তাঁর বুকের ব্যথাটা একটু কমেছে নাকি ?

সুফিয়া প্রথমে একটু আম্‌তা আম্‌তা কর্‌ল, তারপর গলা পরিষ্কার করে' বল্‌ল—হ্যাঁ, তিনি আজ ভালোই—দিব্যি ঘুমুচ্ছেন।

ওস্‌মানের আগ্রহ আরো বেড়ে' চল্‌ল।

—তবে মাকে নিয়ে যেতে এসেছ বুঝি ?

আগামীবারে সমাপ্য

সুফিয়া স্বাভাবিকতার সীমা ছাপিয়ে বল্‌ল—মাগো! মুখে যেন খই ফুটছে।—একটু জিরিয়ে পরে ঝাঁজিয়ে বল্‌ল—আমি কাউকে নিতেও আসিনি, আর কিছু বল্‌তেও আসিনি।

ওস্‌মান নির্ব্বাক। কিছুই আয়ত্ত কর্‌তে. পার্‌ল না। অতল দু'টি চোখ প্রসারিত করে' সুফিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইল। চোখ নয় যেন দু'খানি সুবৃহৎ জিজ্ঞাসা চিহ্ন। মোটের ওপর ওস্‌মানের ওই চাহনির বদলে বলা যেতে পারে —তবে?

সুফিয়া মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে বলে ফেল্‌ল—ধরুন যদি আমি বলি যে,—বিয়ে বাড়ী গিছ্‌লুম, ফের্‌বার পথে হঠাৎ পথ ভুলে গেছি; তা'হলে কি অন্যায় হবে কিছু?

অন্ধকার পথে পথ হাত্‌ড়ে চল্‌তে চল্‌তে ওস্‌মান যেন হঠাৎ একটি "টর্চ্চ-লাইট" কুড়িয়ে পেয়ে গেছে।

এমনি তার আনন্দ!

সুখ পেয়ে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—বেশ লক্ষ্মীটি রোজ এমনি রাতে পথভুলে চলে এসো—কেমন? আরে, এদিকে এসে ভালো হয়ে বোস—তুমি যে মেহ্‌মান—

এমনি করেই বুঝি মানুষ যুগে যুগে খেয়ালী হয়ে ওঠে, বাঁশীর কাঁদনে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, বঞ্চিত-জীবন ব্যর্থতার অভিশাপে হাহাকার করে বুক চাপ্‌ড়ায়। এমনি করেই বুঝি

আগামীবারে সমাপ্য

পূর্ণিমার চাঁদের সাথে রজনীগন্ধার ইসারা চলে, কুমুদের সাথে মিতালী হয়।

সোহাগের ছোঁয়ায় সুফিয়া যেন শরতের হাল্‌কা-মেঘের মতো ঝর্‌ ঝর্‌ করে' ঝরে পড়তে চায়। মৃদু হেসে বল্‌ল—থাক্‌, থাক্‌, আর আদর দেখাতে হবে না।—বলে একটু গম্ভীর হয়ে আবার বল্‌ল—আমার ওপর বলে কি জুলুম—আর উনি বসে বসে—

বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

ওস্‌মান কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ল না। অবুঝ অবাক্‌ শিশুর মতো হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। সে যে নিরপরাধ এ কথাটাই শুধু ওকে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ল। বল্‌ল—আহ্‌হা! কেঁদো না, এমনি কাঁদ্‌তে নেই। আমার অন্যায় হয়ে থাক্‌লে মাফ্‌ করো সুফিয়া।

সুফিয়া অভিমানে ফুলে' উঠ্‌ল। বল্‌ল—আমি কি তাই বল্‌ছি নাকি?

—বল্‌ছি যে, ফের্‌! চুপ কর্‌লে না? রাত্রে চোখের পানি ফেল্‌তে নেই।

সুফিয়ার মনে হ'ল, এ লোকটাকে অভিযোগ বোঝাবার মতো ভাষা হয়ত আজো সৃষ্টি হয়নি।

সে ফুলে' কেঁদে ওস্‌মানকে জানাল—আজ মা আর বাবা

কত কথা বলাবলি করছেন,—বাবা কোন দিন আমার ওপর চোখ রাঙাননি আজ তিনিও চটেছেন। আর সে কি ধমক্ তাঁর।

ওস্‌মান বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

—কি বল্‌ছ সুফিয়া, আমি যে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে।

সুফিয়া ছোঁ করে উঠ্‌ল। বল্‌ল—না, তা' বুঝ্‌তে পার্‌বেন কেন! সকলের মন ত আর এক রকম নয়।—আমার অবস্থা যদি আপনার হ'ত তা' হলে বুঝতে পার্‌তেন।—একটু দম নিয়ে বল্‌ল—মা-ত' আজ মুখ ফুটেই বলেছেন?

ওস্‌মান ঘাব্‌ড়ে গেল—কি বলেছেন?

—তাও আবার খুলে বল্‌তে হবে নাকি?—এই যে দিনের মাঝে একশ'বার আপনাদের বাড়ী আসা, আপনার সাথে এত মেলামেশা, এত গল্প-গুজব করা। ইত্যাদি—

ওস্‌মান যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে।

খানিক দু'জনেই চুপ।

ওস্‌মান খানিকক্ষণ বসে বসে কি যেন ভাব্‌ল, তারপর একটা ঢোক গিলে বল্‌ল—আজ তোমার বাড়ী থেকে না বেরুলেই ভালো হ'ত, সুফিয়া। এতে দু'জনারই অমঙ্গল হ'তে পারে।

মুহূর্ত্তে সুফিয়া কেমন যেন হয়ে গেল। স্তম্ভিত, বিবর্ণ, ঘোলা।

খানিক পর সে সটান্ উঠে দাঁড়িয়ে গেল। পরে গলা পরিষ্কার করে' বল্‌ল—আমি কি আপনাদের বাড়ী আস্‌ব বলে বেরিয়েছি নাকি? থাকুন, আপনার মঙ্গল নিয়ে আপনি। আমি চল্‌লুম।—বলেই চল্‌তে উদ্যত হয়।

নিস্তরঙ্গ নদীর মতো এই শান্ত নিরীহ মানুষটি আজ কেমন করে' জানি অশান্ত উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ল। খপ্ করে স্বফিয়ার হাতটা মুঠা চেপে ধর্‌ল। বল্‌ল—চল্‌লে যে বড়ো? অম্‌নি যায় আর কি? ভারি ত' যায়! হেঃ—

—আঃ, দেখি হাত ছাড়ুন। আমি কারো অমঙ্গলের কারণ হ'তে চাইনে।

—ছিঃ! স্বফিয়া, তুমি এমন ছেলেমানুষ। শুধু মুখের একটা কথাকেই অত বড় করে দেখ্‌ছ, অথচ আমার প্রাণের ভেতরকার অবস্থাটা কি—তা একবারও বুঝতে চেষ্টা কর্‌ছ না।

স্বফিয়া যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। বল্‌ল,—আমি আপনাকে না দেখে কেমন করে' থাক্‌ব। আমায় যে আর রেলিংয়েও দাঁড়াতে দেবে না।—আমি কেমন করে' থাক্‌ব—

বল্‌তে বল্‌তে পরম নির্ভরতার সাথে দু'খানি কোমলবাহু লতার মতো ওস্‌মানের গলায় জড়িয়ে যায়। অশ্রু-ভারাতুর মুখখানি ওর বুকে লুকিয়ে পক্ষি শাবকের মতো কাঁপে।

ওস্‌মান বুকে একটা অস্থির স্পন্দন অনুভব করে।

নারীদেহের কোমল ঘনতর স্পর্শ, কুমারীর অসহায় আত্মনিবেদন, চুলের সোঁদা স্নিগ্ধ গন্ধ ওর শিরায় শিরায় এক অশান্ত শিহরণ জাগে। এক অসতর্ক অবসরে ওস্‌মানের হাত দুটিও আশ্রয় খোঁজে।

তারপর সুফিয়া এই স্নেহাবেষ্টন থেকে নিজেই নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

সুফিয়া শুধোয়—আচ্ছা, আমায় না দেখে আপনি থাকতে পারবেন?

ওস্‌মান বলে—অসম্ভব সুফিয়া, আমি কিছুতেই তা' পারব না।

আর কেউ কোন কথা বলে না। নিস্তব্ধ হতবাক্‌ হয়ে এ-ওর দিকে চেয়ে থাকে।

খানিকক্ষণ এমনি কেটে যায়।

পরে সুফিয়া বলে—চুপ করে রইলেন যে? ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে নাকি? কি, কথা কইছেন না যে?—ওর কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা।

ওস্‌মান যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। বলে—আমি যে কথা কইতে পারছি না সুফিয়া। তুমি কাছে থাকলে আমার সব কথা যেন হারিয়ে যায়। আমি যেন—

স্থফিয়া কথাটার মাঝখানেই আপত্তি করে' ওঠে—হয়েছে, হয়েছে থামুন। কথার ব্যাপারী।

ওস্‌মান কি যেন বল্‌তে গিয়েও থেমে যায়।

স্থফিয়া মুখের হাসি টিপে বলে—এবার একটি গল্প বলুন।

—গল্প ?—ওস্‌মান অবাক্ হয়ে শুধোয়।—কি গল্প বল্‌ব, স্থফিয়া !

স্থফিয়ার জীবনের কল্লোল উচ্ছ্বাসের এ যেন এক শুভ-লগ্ন। বলে—বলুন না, এক দেশে ছিল এক দোকানদার, আর এক বেহায়া জাঁহাবাজ মেয়ে।—পরিচয়ের ভেতর দিয়ে উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা জন্মালো, এমন কি এক মুহূর্ত্তও কেউ কাউকে না দেখে থাকৃতে পারে না।—বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ চুপ করে' যায়।

ওস্‌মান কৌতূহলী হয়ে বলে—তারপর ?

স্থফিয়ার কোমল ঠোঁটে লজ্জাতুর একটু ইসারা ফোটে। বলে—তারপর কারুর কাছে কিছু না বলে' একদিন দু'জনেই চম্পট !—বলে নিজে নিজেই খিল্ খিল্ করে' হেসে ওঠে।

স্থফিয়া যেন বেসামাল হয়ে গেছে।

ওস্‌মানের মুখে কথা জুয়ায় না। ভাবে :

নির্জ্জন রাত্রির গোপনতায়, অচেতন তন্দ্রার ঘোরে যে স্থফিয়াকে প্রথম দেখা গিয়েছিল এ যেন সে নয়। এত সন্নিকটে, এত আত্মীয়তায় আজো স্থফিয়াকে ঠিক বোঝা গেল না।

সুফিয়া খাম্‌কা প্রশ্ন করে' বসে—আপনি বিড়ীর ক্যান্‌ভাস কর্‌তে কবে যাচ্ছেন মফঃস্বল ?—বলেই একটু থেমে পরে ঘাড় কাৎ করে' বলে—আমাকেও সাথে নেবেন ?

আবার সেই রক্ত-মাতাল হাসি।

ওস্‌মান বিস্মিত হয়ে বলে—এর মানে ?

সুফিয়া যেন বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে—সব কথারই মানে খুঁজ্‌তে হয় নাকি ? আহা-হা, ন্যাকা !

ওস্‌মান হতভম্ব হয়ে যায়।

সুফিয়া ওস্‌মানের মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচ্‌কে বলে—কী, অমন মুখ গোম্‌সা করে' আছেন যে ? কী ভাব্‌ছেন ?

ওস্‌মান যেন হঠাৎ স্বপ্নে কথা বলে ওঠে—আমি কী ভাব্‌ছি শুন্‌বে ?

মুহূর্ত্তের জন্য সুফিয়ার মুখভাব অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।
—কী ?

ওস্‌মান ফড়্ ফড়্ করে' বলে চলে—ভাব্‌ছি, কোথায় ছিলুম আমি, আর কোথায় ছিলে তুমি। ভাব্‌ছি, কেমন করে' আমরা পরস্পরে সোতের মুখে পড়ে গেলুম। কেমন করে' আমরা এতদূর এলুম।

সুফিয়া কথা বলে না। অবাক্ হয়ে ওস্‌মানের মুখের

দিকে চেয়ে থাকে। ওব চোখেব দৃষ্টিতে যেন অন্তবেব প্রীতি-আবেদন ঝরে' পড়ে।

ওস্‌মান বলে—তাবপব আবার কোথায় গিযে পড্‌ব, তা' কে জানে।

সুফিয়া নবম হয়ে বলে—সত্যিই, আজ আমাবও মনে হচ্ছে—

হঠাৎ ওস্‌মানেব মা'ব ঘব থেকে কি একটা শব্দ আস্‌তেই ওস্‌মানেব কাণ দু'টি খাড়া হযে ওঠে। গা-ঝেড়ে বাইবে এসে পড়ে।

অনুমান মিথ্যে নয। ওস্‌মানেব মা তখন ঘবে ঢুকে কপাটে খিল্ দিযে দিযেছে। ওস্‌মানেব মাথা ঘুবে যায, সর্ব্বনাশ। মা শুন্‌তে পাননি ত'?

সে হতভম্ব হযে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িযে থাকে। তখন বিযে বাড়ীব কোলাহল থেমে এসেছে। হঠাৎ মনে হয়, চাবিদিকেব অবাবিত শূন্যতা যেন ওকে ঘিবে ওব কণ্ঠরোধ কবে' দিতে চায়।

ওস্‌মান যেন দেওযানা হযে ওঠে।

কি ভেবে হঠাৎ বেহুঁসেব মতো উঠান থেকে বেরিয়ে আসে একেবাবে বাস্তাব ওপব।

অকাবণ পথ চলা সুরু হয।

এ যেন বীণা ফেলে পলাতক শিল্পীব অনির্দ্দেশ পথে যাত্রা।

চলে আর ভাবে। কি যে ভাবে, তা' সে নিজেই বুঝ্‌তে পারে না। এমনি অকারণ পথে পথে ঘুরে যখন বাসার দিকে ফেরে, তখন রাত শেষ হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হয়, বাজীকরের পুতুলের মতো কে যেন তাকে এতক্ষণ নিষ্ঠুর ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল।

কেমন করে' যে কি একটা লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে গেছে, তা' যেন সে নিজেই ঠাহর করে' উঠ্‌তে পারে না। ভাবেঃ

আজিকার এমন একটি রাত্রি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। আর হয়ত জীবনে সুফিয়ার সাথে কথা হবে না, কিম্বা হয়ত সুফিয়াকেই আর দেখ্‌তে পাবে না। সে এতক্ষণ কাছে থাকলে দু'জনে মিলে কত কথা-ই-না বলাবলি হ'ত। কিন্তু তার মা' যদি সুফিয়ার গলার আওয়াজ পেয়ে থাকে, তবে? তবে সে কেমন করে' দিবালোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার মা'র সাথে কথা বল্‌বে? ছি ছি!

বড় বড় পা ফেলে বাড়ীর সাম্‌নে এসে একবার থম্‌কে দাঁড়ায়। ইস্‌! পূবের দিক্‌টা এমন কেন, সুদূরের কোন গিরি-চূড়ায় আগুন লেগেছে নাকি?

বাড়ীর ভেতর ঢুকে, ঝোঁকের মাথায় কি ভেবে ওই ঘরের কাছে বার দুই পায়চারী করে। তারপর কোন এক অসতর্ক অবসরে একটা অস্ফুট আর্তস্বর বেরিয়ে আসেঃ

আগামীবারে সমাপ্য

—স্থফিয়া !

দরজাটা ভেজানোই ছিল। ঠেলা মার্‌তেই দেয়ালে বাড়ী খেয়ে কঠিন কাঠের পাট্ কেঁদে ওঠে।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়।

দুর্ব্বল প্রদীপ-শিখাটি ওখনও তেমনি আলো ছিটিয়ে আছে। কিন্তু স্থফিয়া নেই। সে-যে প্রেম নিবেদন কর্‌তে এসে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেছে। সে নেই। আছে শুধু একটা স্মৃতির কঙ্কাল। হয়ত বা স্মৃতির একটা সূক্ষ্ম মিঠা গন্ধ। কিন্তু সে নেই।

ওস্‌মান যেন একটা টাল্ খেয়েই চৌকিটার ওপর বসে পড়ে। শূন্য শয্যার দিকে কাঙালের মতো চেয়ে থাকে।

স্থফিয়া যেন ওকে নিঃস্ব করে' গেছে।

স্থফিয়া নেই! মনের এই অসহিষ্ণু অস্থির গুঞ্জরণ যেন আর কিছুতেই থাম্‌তে চায় না।

সেই হতে দু'দিন আর স্থফিয়ার দেখা নেই।

ওস্‌মান ব্যস্ত ব্যাকুল হয়ে দু'টি কালো চোখের দৃষ্টি খুঁজে

বেড়ায়। রেলিংটার চারিদিকে একটা রুদ্ধ অভিমান যেন স্তন-লোলুপ শিশুর মতো কোকিয়ে কাঁদে।

ওদিকে চেয়ে চেয়ে ওযেন মস্তমোটা কাব্য রচনা করে।

তৃতীয় দিন। পড়ন্তবেলা—

ওস্‌মান ফ্যাক্টরীর বারান্দায় বসে তেমনি ধ্যানে সমাহিত।—এমন সময় কালো মোটা অল্পবয়সের একটি ছোক্‌রা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই একখানা খাম্‌ ওসমানের গায়ে ছুড়ে ফেলে বল্‌ল—এই যে—এই নিন, এই যে চিঠিখানা—

ওস্‌মান চম্‌কে উঠে একটু অপ্রস্তুত হয়েই চিঠিটা কুড়িয়ে নিল।—কার চিঠি?—ও, হ্যাঁ আমারই বটে। কে দিলেরে? কিন্তু উত্তর দেবে কে? ছোক্‌রাটি এই স্বল্প সময়ের ফাঁকেই উধাও হয়ে গেছে। ছেলেটা যেন ওই টাইম্‌পিসের কাঁটার মতোই নিষ্ঠুর। মানুষের প্রয়োজন তাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। এমনি সময়ের অধীন সে।

উৎসুক হয়ে তাড়াতাড়ি খামের বুক চিরে চিঠি বের করতেই ওস্‌মানের আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সুফিয়া লিখেছে। বড় তাড়াতাড়ি হাতে লেখা। হরফ গুলো যেন অস্থির হয়েই একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়েছে।

পড়তে পড়্‌তে ওস্‌মানের মনে যেন খপ্‌ করে' আগুন ধরে গেল

আগামীবারে সমাপ্য

'……ইচ্ছা ছিল, তেম্‌নি আর এক অপরূপ রাতে আবার দু'জনে পাশাপাশি বসে গল্প করব, দু'জনের মনের ইতিহাসের পাতাগুলো দু'জনেই পড়ে পড়ে দেখ্‌ব। ইচ্ছা ছিল, কিন্তু থাক্ সে কথা!

আপনাকে না দেখে, না—এখন আর 'আপনি' বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না। তোমাকে না দেখে প্রতিটি মুহূর্ত্ত যে, কেমন করে' গুণে গুণে কাটাচ্ছি, তা' হয়ত তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। পর্শু বাবা আমাদের সঙ্গে নিয়ে দেশে যাবেন। বাড়ীতে পরম্পর শুন্‌লুম, আমার আইবুড়ো নাম ঘুচোবার জন্যেই নাকি এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থা। কাল রাত্রে এগারোটার গাড়ীতে রওয়ানা হবার জন্য বাক্স-পেঁটারা গুছিয়ে সবাই প্রস্তুত হয়ে আছেন। আমার কিন্তু কিছুতেই যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, তোমায় ছেড়ে। কি-যে করব, তা' কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে। ওই ছেলেটাকেই আবার পাঠিয়ে দেবো, জবাব লিখে দিয়ো। আচ্ছা, বল্‌তে পারো, মনের পোড়া কাঠের আগুনটাকে মানুষ যতই ছাই-চাপা দিতে চায়, ততই সে আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলে ওঠে কেন? কেন এমন হয়? কিন্তু বড় আশ্চয্যি মানুষ তুমি।'

তারপর কি যেন একটা কথা কেটে দিয়ে, তার নীচে বড় করে' নিজের নাম লিখেছে—'সুফিয়া'।

চিঠিটাকে বার বার পড়ে' ওসমান যেন একটী গীতি-কবিতার মতোই মুখস্থ করে' নিতে চায়। থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত পড়া একটি মেয়ে এমন করেও চিঠি লিখতে জানে? উচ্ছ্বাস যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

জীবন যে এত মধুময় ওস্‌মান যেন তা' আগে জান্‌ত না।

মনে হয়, এই নিষ্ঠুর বাস্তব জগতের চাইতে একটা শান্ত স্নিগ্ধ মমতাময় জগত যেন কোথায় আছে—সুফিয়ার এ চিঠিতে যেন তারি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

সুফিয়ার কথাগুলো যেন ওর বুকের ভেতর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো আনাগোনা করে। সহৃদয়তা লাভ করার মধ্যে যে মধুরতা আছে তার জন্য ওর মন আতুর হয়ে ওঠে। ও যেন মনে মনে কোন প্রগল্‌ভা কুমারীর কুণ্ঠিত লাজুক অথচ উষ্ণ কোমল স্পর্শ অনুভব করে।

কিছুক্ষণ এমনি কেটে যায়। আবার চিঠিটা খুলে পড়ে, এবার মনের পট পরিবর্ত্তন হয়। ওই চিঠিখানির প্রত্যেকটি কথায় ওর মনে যেন তীব্র নেশা ধরে যায়। একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষার মাদকতায় রক্ত আবার ফেনিল হয়ে ওঠে।

এক অসাধারণ সঙ্কল্প স্থির করে' নিজের মনেই কথা কাটাকাটি করে' চলে—তাই ত'! সুফিয়াকে ছেড়ে কেমন করে' বেঁচে থাক্‌বে সে? ওকে না দেখে এই তিন দিনের মধ্যেই ত' পাগল হয়ে উঠেছে। না, আজই!—সুফিয়াকে নিয়ে পালাতে হবে তার। আর ফ্যাক্টরী?—তা' থাক্‌গে।

ওর বুকের ভেতর যেন মনের সমস্ত মূল ধরে এক প্রচণ্ড বন্যা চলেছে।

আগামীবারে সমাপ্য

অস্থির হয়ে চিঠির উত্তর লিখে যায়ঃ

'সে অনেক কথা সুফিয়া, লিখে তা' বোঝানো যাবে না। সাক্ষাতে বল্‌ব সব। এই তিন দিনের ব্যবধানেই বুঝ্‌তে পেরেছি তুমি আমার মনের কতটুকু জায়গা দখল করে' আছ। আজ তোমার চিঠি না পেলে এতক্ষণ হয়ত পাগল হয়ে পথে নেমে পড়্‌তুম। আমার মনকে তুমি খুন করেছ, সর্ব্বস্বান্ত করেছ, আমি কিছুতেই তোমায় চলে যেতে দেবো না। যদি মরতে হয়, তবে দুজনে মুখোমুখি হয়েই মর্‌ব। তুমি অন্যের হবে, একথাটা শুনেও আমি কেমন করে' বেঁচে থাক্‌ব বলো ত'? যাক্! আমাকে যদি একবিন্দুও ভালোবেসে থাক, তবে আজ রাত্রেই আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে তোমার। আজ রাত্রে ঠিক যখন বড় মস্‌জেদে এসার আজান পড়্‌বে তখন তুমি তোমাদের বাড়ীর পেছনের গলির দিক্‌কার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ো। আমি এসে শিষ্‌ দেবো। কিন্তু দেখো, শেষে আবার পেছিয়ে যেয়ো না যেন। আর.........'

আরো অনেক কথা ওস্‌মানের লিখ্‌বার ছিল, কিন্তু এরি মাঝে সেই থ্যাব্‌ড়ামুখো ছেলেটা এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খামে পুরে' ওর হাতে দিয়ে বলে—দেখিস্‌ অন্য কারুর হাতে পড়ে না যেন।

ছেলেটা উত্তর না দিয়েই নিজের পা দু'টিকে চঞ্চল করে' তোলে।

ওস্‌মান বাধা দেয়—ওই, ওই দাঁড়া! শোন, কাছে আয়—এইনে, আনিটা তোকে দিলুম, কিছু কিনে খাস্‌। আর ছাখ,

এই দিকে আয়, ভালো করে' খাম্‌টা তোর বুকিটার তলে লুকিয়েনে।

ছেলেটা তেম্‌নি ফুটবলের মতো লাফাতে লাফাতে চলে যায়।

দিনের আলো মুছে গেছে তখন।

ওস্‌মান তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে কারিকরদের বিদায় করে' দেয়। তারপর ফ্যাক্টরী বন্ধ করে' বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে।

ওই অবসন্ন ব্যথাতুর সন্ধ্যার মতো মনের চারিদিকে যেন ধীরে ধীরে অন্ধকার আবার ঘনিয়ে আসে।

ঘরের খুঁটিনাটি হতে আরম্ভ করে' প্রত্যেকটি জিনিষ যেন সুনিবিড় মমতার মতো চারিদিক থেকে ওস্‌মানকে বেঁধে ফেলে। ভাবে ঃ

এই সবই ছেড়ে যেতে হবে? ওই ফ্যাক্টরী, কত কঠোর পরিশ্রম করে' গড়ে তুলেছিল, আজ তা'ও ছেড়ে যেতে হবে! জ্ঞানাবধি সে তার পিতাকে কখনো দেখেনি। দেখেছে শুধু এই দুঃখিনীকে—যে নিজের বুকের সবটুকু স্নেহ-মমতা উজাড় করে' ওকে বড় করেছেন, মানুষ করেছেন। যে তাকে চোখের তারাটির মতো চোখে চোখে গেঁথে, স্নেহ-রসে সিক্ত করে' রেখেছেন—সেই মমতাময়ী মাকেও ছেড়ে যেতে হবে?

হঠাৎ মা'র কথায় ওস্‌মানের চমক্ ভাঙ্গে। তিনি যে কখন এসে ঘরে ঢুকেছেন ও তা' দেখেনি।

মা বলেন—এমন হয়ে বসে যে ওস্‌মান। বাইরে কোন কাজ নেই ?

ওস্‌মান অপ্রতিভ হয়ে বলে—আছে মা, মাথাটা বড্ডো ধরেছে বলে—

—শো, টিপে দিই।

ওস্‌মান চৌকিটার কিনারে পা দু'টি ঝুলিয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

মা রেগে বলেন—ওই বুঝি তোর শোয়া হলো ?

ওস্‌মান হেসে ভালো হয়ে শুয়ে বলে—নাও, হলো ত' !

মা নিঃশব্দে ওর কপালের চামড়াটা টিপে চলেন।

একটা অবসন্ন নিরবতায় যেন অকস্মাৎ মনের বেদনা গুম্‌রে ওঠে। মা বলে ওঠেন—বাবা, বিশেষ জরুরী একটা কথা তোকে বলি বলি করে' বলা হয় না।

ওস্‌মানের বুক দুরু দুরু করে' ওঠে। কাতর কণ্ঠে বলে—কি মা ?

মা ধীর ভাবে বলেন—আমি তোর মা, তোর মন আমি জানি। তুই পেটের ছেলে হলেও এটা লজ্জার কথা নয়।—বেটাছেলে যখন, বিয়ে একদিন কর্‌তেই হবে।

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই মা থেমে পড়েন। মনে হয়, যেন পর পর কথাগুলো স্মরণ করে গুছিয়ে নিচ্ছেন।

মা'র এই কথার সাথে ওস্‌মানের মনের যেন যোগ আছে। ওর বুক কেঁপে ওঠে।

মা আবার আরম্ভ করেন—হ্যাঁ, বুঝেছিস্‌ বাবা, আমি সুফিয়ার মার সাথে আলাপ করেছিলুম। বলেছিলুম—'আমি আর ক'দিনই বা বাঁচ্‌ব—আমার ওস্‌মানকে তোমাদের হাতেই সপে দিতে চাই। এক মেয়ের বদলে এক ছেলে পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয় মা। এখন তোমরা যদি গরীব বলে আপত্তি না কর—তবেই আমার মনের মকৃসুদ হাসিল হয়।'—কিন্তু সুফিয়ার বাবার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। দু'টো পয়সা আছে বলেই কি অমন কথা বল্‌তে হয় যে—'বিড়ীওয়ালার সাথে আমাদের আত্মীয়তা চল্‌তে পারে না'।

একটু ইতস্ততঃ করে ফের বলেন—তা' দুঃখ কি বাবা, খোদার হুকুম হ'লে কত বড় লোকের মেয়ে তোমায় যেচে দেবে। একটু বুঝে-সমঝে চলো, মানুষ হবার চেষ্টা করো, মনোযোগ দিয়ে কাজ-কর্ম্ম করে দু'টো পয়সা করো। তারপর দেখ্‌বে—

কি জানি কেন মা'র কণ্ঠটা বুজে আসে। হয়ত অন্তরের নিবিড় বেদনা ঘা খেয়ে জেগে ওঠে। আর কিছু না বলে নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে যান।

একটা অকথিত ব্যথায় ওস্‌মানের বুকের শিরা উপশিরা থেকে আরম্ভ করে চোখের শিরা পর্য্যন্ত টন্‌ টন্‌ করে ওঠে।

তা' চোখে জল আসবে বৈ-কি।

গরীব বলে কি সে মানুষ নয়? শিক্ষায়, ভদ্রতায়, মনুষ্যত্বে সে-যে কারুর কাছে খাটো নয়, অর্থহীন বলে কি ওর আত্মসম্মানের কোন মূল্যই নেই? বিড়ীর ব্যবসা করে বলে পচে গেছে নাকি সে? ওর ব্যক্তিত্বের এমন নিদারুণ অপমান, ওর আত্মসম্মানের এমন দুঃসহ লাঞ্ছনা! ওর মনুষ্যত্ব কি পথের ধুলোর চাইতেও সস্তা?

হঠাৎ যেন একটা স্রোতের মুখে পাষাণের চাপা পড়ে যায়।

সে রাত্রে অপরিসীম অশ্রদ্ধায় সুফিয়ার প্রতি মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পালিয়ে যাবার সঙ্কল্প তখন কাঁটার মতো বুকে বিঁধে।

মনে হয়, এই ধনী পৃথিবী যেন মমতাহীন, মনুষ্যত্বহীন, নিষ্ঠুর।

সে তাড়াতাড়ি জানালা কপাট সব বন্ধ করে দেয়। কি জানি পাছে সুফিয়ার বৃহৎ চোখ দু'টি যদি ওই জানালাটার ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে ওঠে।

নিষ্ঠুর দৃঢ়তার সাথে নিজেকে সংযত করে' শুয়ে পড়ে তারপর।

সকালে উঠে ওস্‌মান মনের সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দেয়।

গত রাত্রে সুফিয়াকে নিয়ে কেমন করে' যে সে লম্বা দিতে

চেয়েছিল ভেবে অবাক্ হয়ে যায়। মনটা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে।

ওব ভেতবেব আত্ম-সমাহিত মানুষটি কাব অভিশাপে যেন হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে জেগে উঠেছে। ভাবে ঃ

নাঃ, আমাকে মানুষ হতে হবে, অর্থ সঞ্চয় করে' বড়ো হতে হবে। জীবনেব প্রথমেই অনেক ক্রুটি হযে গেছে, এই অবসন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত জীবনকে আবাব নূতন কবে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। আজ সে অর্থহীন বলেই সুফিযাব পিতা বিডীওযালা বলে ঠাট্টা কবে' ওব মাকে অপমানিত কবেছেন।

অপমানেব আঘাতে ওব মনটা যেন একেবাবে চূবমাব হয়ে গেছে।

নিজেব এই অযোগ্যতায নিজেব ওপরই ক্রোধ হয।

হঠাৎ কি ভেবে সুফিয়াব চিঠিটা চিরে টুক্‌বো টুক্‌বো কবে' ফেলে। সুফিযাব প্রদত্ত নাম-লেখা রুমালখানা দেশলাই দিযে আগুন ধরিযে দেয়। ওব স্মৃতিও যেন ওস্‌মানেব পক্ষে অসহ্য।

তাবপব এমনি বসে বসে ভাবে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে ওব মন যেন নতুন শ্রী লাভ করে।

সে মনে মনে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

সেদিন নতুন উদ্দেশ্য ও অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফ্যাক্টরীব কাজ আবম্ভ হয়।

আগামীবারে সমাপ্য

মা'ব স্নেহ-নিবিড দু'টি চোখে নীড়-বচনার স্বপ্ন আবাব সার্থক হয়ে ওঠে।

মা অবাক্ হয়ে যান।

পবদিন। মেঘেব সাথে জডিযে জডিয়ে বেলা গডিয়ে গেছে। আকাশ যেন পুত্র-হাবা মাতাব মতো বিষন্ন।

ওপাশেব দোতলাব বেলিংয়েব ওপব সুফিয়া এসে দাঁডাতেই হঠাৎ একটা তন্ময়তা ভেঙ্গে ওসমানেব চোখ দু'টি কেমন হযে যেন জেগে উঠ্ল। অস্থিব, চঞ্চল।

ওস্মান ভেবেছিল, সুফিযাব সাথে আব দেখা কব্বে না। চোখা-চোখি হলেও সে মুখ ফিবিয়ে নেবে। কিন্তু সে তা' পাব্ল না। বালুবেলাব ঘবেব মতো তাব সঙ্কল্পেব ভিত্তিতে তখন ভাঙ্গন ধবেছে।

বিস্ফাবিত দৃষ্টিতে ওস্মান চেয়ে বইল। এবি মাঝে সুফিয়া এতটা বদ্লে গেছে? উদ্দাম সাগবেব তবঙ্গ থেমে গেছে নাকি? ওর আযত কালো চোখ দু'টি যেন ওই বর্ষণোন্মুখ মেঘের মতোই ভেজা। কোথায গেল সেদিনেব সেই চটুল-হাস্যময়ী প্রগল্ভা কুমাবী? মুখেব হাসি কি শুকিযে ধুলোব সাথে মিশে

গেছে? চিরমুখর মুখ কি ভাষা হারিয়ে বোবা বনে গেছে? কোন্ অবারিত পথের ইঙ্গিত ওকে এমন করে' মর্ম্মান্তিক উদাসীন করে' তুল্‌ল? কাব্য-লোকের কোন্ অতর্কিত মায়া ওর জীবনের সমারোহকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে ঝল্‌সে দিল?

করুণায় ওস্‌মানের দু'চোখ জ্বালা করে উঠ্‌ল।

স্থফিয়া যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল। যাবার কালে ওর ডান হাতটা কপালের ওপর তুলেছিল না? বৃহৎ দু'টি চোখ দিয়ে জলের ফোঁটা কেঁপে কেঁপে ওই রেলিংটার ওপরই পড়েছিল বুঝি?

তারপর আবার সেই ছন্দপতন!

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওস্‌মান ভাব্‌তে লাগ্‌ল:

স্থফিয়া সত্যিই চলে গেল? তা' যাক্! গল্প-লোকের নায়কের মতো সে চিরদিন তার স্মৃতির সম্মান করবে, অবিবাহিত থেকে সে স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করবে। এই স্মৃতিই তার কাঙাল জীবনের পরম সম্পদ হয়ে থাক্‌বে। জীবনের আকাশে এই তার প্রথম বিদ্যুৎ জ্বলার দাগ। এ দাগ কিছুতেই সে ভুল্‌তে পারবে না। কিন্তু স্থফিয়ার সাথে একবার দেখা করে' দু'টি কথা বল্‌লে কি-ই-বা এমন দোষের হ'ত?

এমনি নানান্ কথা ভেবে ভেবে মনকে সে যতই প্রবোধ দিতে চায়, ততই সে নিষ্ঠুর ভাবে নিজের কাছেই ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু যে মনে প্রেমের স্বপ্নের শেকড় বসে গেছে, সে মনের খেই হারাতে কতক্ষণ?

কি মনে করে' ওস্‌মান হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে গেল। বাতিটা উস্‌কে দিতেই টাইম্‌পিসের কাঁটা দু'টি চক্‌ চক্‌ করে' উঠ্‌ল—এগারোটা বাজ্‌তে এখনো মিনিট কুড়ি বাকী। জামাটা গায় দিয়ে, বাতিটা একটু মিট্‌মিটে করে, কপাটে ছিকল এঁটে বেরিয়ে পড়্‌ল রাস্তায়।

বর্ষার আকাশ। টিপে টিপে বৃষ্টি পড়্‌ছিল। ছ্যাকরা গাড়ী যখন ইষ্টিশানে এসে লাগ্‌ল, তখন নয়নপুরের ট্রেণ ছেড়ে গেছে। ওস্‌মান অনেকক্ষণ প্লাটফর্‌মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাব্‌ল। তারপর মনের একটা দিশাহীন অস্থিরতায় বৃষ্টির মধ্যেই পথ ভেঙ্গে চল্‌ল।

সমস্তটা পথ ভিজে ভিজে বাসায় যখন এসে পৌঁছল তখন উত্তেজনা নিঃশেষ হয়ে এসেছে। মনে হ'ল, কে যেন একটা প্রকাণ্ড ধাক্কায় ওকে অনেকদূর নিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

দিন সত্যই কাটে! কিন্তু মন তার সুর হারিয়েছে। তার কাঙাল অন্তর কি যে খোঁজে, আর কিসে যে সে পরিতৃপ্ত

হবে তা' যেন ও নিজেই ঠাহর করে উঠ্‌তে পারে না। শুধু এইটুকু বোঝে—শূন্য মনটা যেন একটা অবলম্বন চায়। তারি জন্য হয়ত তার মন ক্ষুধিত শিশুর মতো এমনি কান্না জুড়ে দেয়।

মন যেন বার্দ্ধক্যের সাড়া পেয়ে গেছে। জীবন যেন শুষ্ক নিরস। নিদ্রাহীন রাত্রির অবসন্ন আতুর বাতাস আজো তেমনি গায়ের ওপর লুটে পড়ে। রজনীগন্ধার সাথে চাঁদের আজো কথা চলে, উঠানের মাচার ওপর পুঁইশাকের ডগাগুলো ভোরের বন্ধনহীন আলোয় আজো তেমনি মাথা নেড়ে নেড়ে কথা কয় কিন্তু সেদিনের সে সমারোহ যেন আজ আর নেই। সুফিয়া যেন সব কিছুই মুছে নিয়ে গেছে।

ফ্যাক্টরীতে বসে ওস্‌মান আজো তেমনি ওই শূন্য রেলিংটার দিকে চেয়ে থাকে, যেন কতকালের কত দামী জিনিষ ওইখানে হারিয়ে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট ঘূর্ণী-হাওয়া উঠে' ঘুরে ঘুরে রেলিংএর কাছে মিশে যায়। চড়াই পাখীগুলো দাপাদাপি করে, কিন্তু সবই যেন অর্থহীন, ফাঁকা। ওস্‌মানের হু'চোখ সজল হয়ে ওঠে। সে আজকাল আর ফ্যাক্টরীতে বস্‌তে পারে না।

ওস্‌মানের মুখের দিকে চেয়ে মা'র ব্যথার পাথার দুলে' ওঠে। দু'টি চোখের দৃষ্টিকে মাতৃত্বের করুণায় ভিজিয়ে ওর মুখের কালিমা ধু'য়ে মুছে দিতে চান।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ ?

মা বলেন—চৌধুরী বাড়ীর ওই মেয়েটিকে তুই দেখেছিস্, ওস্‌মান ? ওই যে আমাদের বাড়ী আস্‌ত—

অন্যদিন হ'লে এই প্রশ্ন শুনে ওস্‌মান একটু ভড়্‌কে যেত বৈ-কি। কিন্তু আজ নির্লিপ্তের মতোই বলে—হুঁ।

এ যেন অচেতন ইচ্ছা, অর্থহীন ভাব।

মা বলেন—তুই দিন দিন শুকিয়ে এমন হয়ে যাচ্ছিস্ কেন ? —কথার সঙ্গে ওঁর কণ্ঠস্বর দুর্ব্বল-প্রদীপ-শিখার মতো থর থর কাঁপে। গলা খাঁক্‌রে নিয়ে ফের বলেন—খাবি কিছু ?

—বা! এই না খানিক আগে খেলুম।

—মুখ ত' শুক্‌নো শুক্‌নো—আয়, ডিম্ ভেজে রেখেছি—তুই না ডিম্ খেতে ভালোবাসিস্ ?

—না মা, এখন একটুও খিদে নেই। রেখে দাও—রাত্রে খাব।

কিন্তু এমন একদিন ছিল—যেদিন এই ডিম্-ভাজার কথা শুনে ওস্‌মান রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে, মা'র হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সবটুকু নিজের মুখের ভেতর গুঁজে দিত।

সে দিন চলে গেছে। এখন আর কোন কিছুতেই ওস্‌মানের মন বসে না। ও যেন একেবারে নিস্পৃহ, নিরুদ্বিগ্ন, নিরাকুল।

দিন দুই পর ওস্‌মান একদিন ওর মাকে বল্‌ল—আমাকে

আগামীবারে সমাপ্য

মফঃস্বলে বিড়ীর ক্যান্‌ভাসে যেতে হবে। কালু ছোঁড়াকে বলে গেলুম—ফ্যাক্টরীর কাজ-কর্ম্ম সেই সব দেখ্‌বে। তোমার যখন যা' দরকার ওর হাতেই আনিয়ে নিয়ো। আমি দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আস্‌ছি। ঘাব্‌ড়িয়ো না কিন্তু।

কণ্ঠটা স্নেহে ভিজিয়ে মা বল্‌লেন—ঘাব্‌ড়াব কেন বাবা, তুমি ত' এখন আর ছেলে মানুষটি নও। লেখা-পড়া শিখেছ, খোদা জ্ঞান-গম্যি দিয়েছেন—তুমি যেখানেই যাবে, আমি বুঝ্‌ব নিরাপদেই আছ। কিন্তু এখন না গিয়ে ক'দিন পর গেলে চলে না?

ওস্‌মান আপত্তি করে বল্‌ল—না মা, এখন বাজারের অবস্থা ভালো না, এ সময়েই একবার ঘুরে আসা দরকার।

বেলা আটটার ট্রেণ। ভাগ্যিস্ ওস্মান স'সাতটায় বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল।

নয়নপুর ইষ্টিশানে ট্রেণ যখন এসে থাম্‌ল, তখন বেলা উৎরে গেছে। প্লাটফর্‌মে পা দিতেই ওস্মানের মনটা কেমন যেন একটু তাজা হয়ে উঠ্‌ল। ইষ্টিশানের লোক চলাচলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, তারপর বড় রাস্তার ওপর নেমে আস্‌ল।

রাস্তায় এসে একবার ভাব্‌ল, ঘোড়ার গাড়ীতেই যাবে কিন্তু পরে সে ইচ্ছা ত্যাগ করে' হেটেই চল্‌ল। হঠাৎ একটা লোকের সাথে মুখোমুখি হতেই ওস্মান শুধোল—দেখুন, চাঁপাতলা কোন্ পথে যেতে হবে?

—চাঁপাতলা? কার্ বাসায় যাবেন, বলুন ত?

ওস্মান প্রথমে আম্‌তা আম্‌তা কর্‌ল তারপর ঘাড়ের দিক্‌টা একটু চুল্‌কিয়ে নিয়ে বল্‌ল—করিম মাষ্টারকে চেনেন ত?

লোকটা যেন নিজের মনেই হেসে উঠ্‌ল। তরমুজের বিচির মতো দাঁতগুলো বিকশিত করে? বল্‌ল—তা আবার চিনিনে, চিনি বৈ-কি! তা' চলে যান্‌ এই পথ ধরে একদম নাক-বরাবর—স্থমুখের বাজার পেরিয়ে, ডান-হাতি বড় রাস্তাটা পেছনে ফেলেই আর কি—

লোক্‌টি যেন ওস্‌মানের অতল দু'টি চোখে চাঁপাতলার একটি মানচিত্র অঙ্কিত করে' দিল।

ওস্‌মান বহু কষ্টে হাসি চেপে বল্‌ল—বেশ এখন যেতে পার্‌ব।—বলেই দু'পা এগিয়ে গেল।

কিন্তু যেতে পার্‌ব বল্‌লেই ত' আর যাওয়া হয় না। লোক্‌টা বাধা দিয়ে বলল—দেখুন—হেই সাহেব!

ওস্‌মান ফিরে দাঁড়াল।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে লোক্‌টি যেন ওস্‌মানের কত আপন, কত নিকটতম আত্মীয়। তেমনি দাঁত বের করে' আরো একটু ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—চাঁপাতলার বড় সড়কের মুখেই ইয়া বড়ো বড়ো দু'টো বট্‌গাছ নজরে পড়্‌বে—।—বলেই ডান হাতটা এমনভাবে ঘুরিয়ে নিল যে, আরেকটু হ'লে ওস্‌মানের নাকটাই ভোঁতা হয়ে যেত।

ওস্‌মান্‌ মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। লোকটি নেশা করেনি ত?

আগামীবারে সমাপ্য

তারপর যে যার পথে। ওস্‌মান হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

চল্‌তে চল্‌তে ওস্‌মানের মন আবার রঙিন হয়ে উঠ্‌ল।

ওস্‌মানকে দেখা মাত্রই সুফিয়া হয়ত তেমনি ঠোঁট মুচ্‌কে হেসে ইসারা করবে, হয়ত খিল্ খিল্ করে হেসে ওর কাছেই ছুটে আস্‌বে, হয়ত বা ওর ডান-হাতটা ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌বে। কিন্তু যদি চাঁপাতলায় সুফিয়ার দেখা না পায়, তবে? এমন অপরিচিত যায়গায় সে-ই-বা সুফিয়ার সাথে কেমন করে' দেখা করবে? তা' হোক্! তবু ওর সাথে দেখা না করে' সে আর নগরবাড়ী ফেরবে না। ওর মনের কথাগুলো সুফিয়ার কাছে এক এক করে' খুলে বল্‌বে। তারপর—

হঠাৎ বাস্তবতার সঙ্ঘর্ষে ওস্‌মানের স্বপ্নের সুর যেন কেটে গেল। সুমুখের বাজারের কোলাহলে মন আবার পৃথিবীর ধুলো স্পর্শ করল। কখন যে ওর জলের পিয়াস্ লেগেছিল, তা' ও টেরই পায়নি। পাশের একটা দোকান থেকে কিছু জলখাবার খেয়ে, খানিক জিরিয়ে নিয়ে আবার পথ ধরল্।

দিনের আলো নিভে গেছে। সুমুখের করগেটের চালের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছিল।

বাজারের মোড়টা ঘুরতেই এক ফালি একটি গলি নজরে পড়্‌ল। তারি ভেতর দিয়ে অগুন্তি লোকের যাতায়াত চলেছে। ওস্‌মান ভাব্‌ল, ওই গলির ভেতরেও একটা বাজার হবে।

আগামীবারে সমাপ্য

খানিকটা পথ হেটে যেতেই ওস্‌মানের ভুল ভেঙ্গে গেল। এ কোথায় এসে পড়েছে সে? এটাও বাজার বটে কিন্তু দেহের।

যেখানে রূপ ও যৌবনের বেসাতি নিয়ে নারীত্বের জবাই চলে দিনের পর দিন, কামনাতুর ক্ষুধিত মানুষের অনির্ব্বাপিত তৃষ্ণার আগুন যেখানে লুটে পড়ে, মানুষের এই বঞ্চনায়, এই ব্যর্থতায় সৃষ্টির নিয়ম যেখানে অভিশাপ দেয়।

ওস্‌মানের একবার ইচ্ছা হয়েছিল ফির্‌তে কিন্তু নিকটেই বড় রাস্তা পাবে মনে করে' সেই গলি দিয়েই হেটে চল্‌ল।

দু'পাশে রোগা পট্‌কা, জোয়ান তাজা, নানান্‌পদের জীবন্ত দেহ হরেক রকম সাজে যুদ্ধ-যাত্রীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ওস্‌মানের মনে হ'ল, বিধাতার সৃজিত এই বিরাট গুল্‌-বাগে নারী কি শুধু মৌসুমী-ফুল?

সমস্ত গলিটা এমনি মাড়িয়ে সদর রাস্তাটার মুখে আস্‌তেই ওস্‌মান থম্‌কে দাঁড়াল। ভোজবাজি দেখ্‌ছে না ত'?

ওর চোখের সাম্‌নে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়!

রাস্তার আলোতে সেই পরিচিত মুখটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। তবু ওস্‌মান চোখদু'টি কচ্‌লে, দু'তিনবার পলক মেরে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ওর দেহের স্পন্দমান চেতনা যেন চোখের দুয়ারে এসে পড়েছে।

খানিক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাশের একজোড়া ডুবা

চোখের সাথে ওস্‌মানের চোখো-চোখি চাওয়া-চাওয়ি হতে লাগ্‌ল। এমন তোব্‌ড়ানো মুখে আবার খড়িও ঘষা হয়েছে নাকি?

হঠাৎ এক সময়ে সে বলে উঠ্‌ল—চিন্‌তে পার্‌লে ওস্‌মান?

বহুকালের একটা সুদৃঢ় সৌধ যেন ওস্‌মানের চোখের সাম্‌নে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

ওস্‌মান নির্জ্জীবের মতো বল্‌ল—পেরেছি।

এরি মাঝে ওস্‌মানের মন ধানপুকুরের একটি নোংরা গলির ভেতর চলে গেছে। চার বছর পূর্ব্বে যেখানে ফালিকে একদিন দেখেছিল—মমতাময়ী কল্যাণী বোনের মতো, দরিদ্র গৃহস্থ-ঘরের একটি সেবাময়ী সহিষ্ণু গৃহলক্ষ্মীর মতো, দারিদ্র্য, দৈন্য, কলঙ্ক ও অপমানের বোঝা ব'য়ে সংসারের আরো পাঁচজন পোড়া-কপালীর মতো যে নিঃশব্দে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিত, বেদনার-মেঘে-ভেজা নম্র একটি উপবাসী মুখ নিয়ে যে ওদের উঠান্‌টার ওপর এসে দাঁড়াত, যে ওর মাকে চাচি বলে ডাকৃত, এ কি সেই শরীরিণী ফালি? হায় হতভাগী! এর চাইতে যে ধানপুকুরের ঘোলাটে জলে ডুবে মরাই ছিল তোর ভালো!

ওস্‌মান ফালির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কোন হেতু কোন সঙ্গতিই খুঁজে পাচ্ছে না।

যৌবন গেছে ঠাণ্ডা বাসি হয়ে, দেহের দুয়ারে লেগেছে ভাটা,

চোখের আগুন গেছে নিভে, মুখের রেখা গেছে বিকৃত হয়ে, তবু কেন এই অসময়, যৌবনের এই বাদল বেলায়, এই বিশ্রী আবহাওয়ার ভেতর, এই পঙ্কের মধ্যে ডুবে মরতে এল ?

ফালি হেসে বল্ল—খুব আশ্চয্যি হচ্ছ, না ? .

ওস্মান কোন উত্তর দিল না। আর দেবে-ই-বা কি ? ও-ত' ভেবেই হায়রান্।

ফালি বল্ল—কোথায় গিছ্লে ?

—বিড়ীর ক্যান্ভাসে বেরিয়েছি।

—ও ! এই পথে কি মনে করে' ?

—কিচ্ছু মনে করে' না, এম্নি।

—বাড়ীর সব ভালো ?

—হুঁ।

—এখন ত' তোমার বেশ গা-গতর হয়েছে দেখছি, আগে কী হাড়গিলেই না ছিলে। বৌ কেমন ? ছেলেপুলে কী ?

—বিয়েই করিনি এখনো—

—করোনি ?—বলেই ফালি খোপায়-গোঁজা একটি আধপোড়া বিড়ী বের করে' নিজেই ধরাল। তারপর হুস্ হুস্ করে গোটা দুই দম্ লাগিয়ে নিয়ে, ওস্মানের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্ল—খাবে ?

কুণ্ঠায় যে একদিন মুখের দিকে চেয়ে কথা বল্তে

পারত না, আজ সেদিনের সেই লাজনতমুখী ফালি এমন নির্লজ্জ বেহায়া হ'ল কেমন করে'? কেমন করে' শিখল এসব?

ঘৃণায় রাগে ওস্মানের দেহের শিরাগুলো মোচড় দিয়ে উঠ্ল। ওর ইচ্ছা কর্ল, ফালির মরা চ্যাপ্টা গালে ঠাস্ ঠাস্ ক'খানা থাপড় বসিয়ে দিতে। নিজেকে সাম্লে নিয়ে স্বাভাবিক স্বরেই বল্ল—না, অভ্যেস নেই।

ফালি নম্র ভাবে বল্ল—চলো, ঘরে চলো।

ওস্মান রুক্ষ ভাবে বল্ল—না, আমার কাজ আছে এখন।

ফালি রুখে উঠ্ল। বল্ল—আচ্ছা, যেয়ো।—বলেই ওস্মানের হাতের সুটকেসখানা কেড়ে নিল।

ওস্মান আর আপত্তির সুযোগ পেল না।

টিনের ঘর। তারি ভেতর একটা নড়বড়ে চৌকি। ওস্মান বস্ল ওপরে, ফালি পা ছড়িয়ে বস্ল নীচে মাদুরের ওপর। পূবদিকের টিনের বেড়ায় ঢাকুনিওয়ালা একটি কাঠের আয়না, তার বাঁ-পাশে কি যেন একটা বাঁধানো ছবি। ঝাপ্সা হয়ে গেছে, চেষ্টা কর্লে হয়ত দেখা যায়।

আগামীবারে সমাপ্য

ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওস্‌মানের মনটা কেমন যেন হয়ে উঠ্‌ল।

এই কি বেঁচে থাকা? না জীবনের বিকৃতির মধ্যে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে নিজেকে নিজে হত্যা করা? অস্বাভাবিক ভাবে মাড়িয়ে চলা?

কি মনে করে' হঠাৎ ওস্‌মান প্রশ্ন করে' উঠ্‌ল—তুমি এমন ভালো ছিলে, কেন এমন কাজ করলে? মা পর্য্যন্ত তোমার কত প্রশংসা কর্‌তেন।

ফালি চম্‌কে উঠ্‌ল—কী করেছি?

ওস্‌মান এর আর উত্তর দিতে পার্‌ল না। হয়ত বল্‌ত—তোমার নারীত্বকে, তোমার মাতৃত্বকে জবাই করেছ, খুন করেছ, কলঙ্কিত করেছ।

ওকে চুপচাপ্ দেখে ফালি নিজেই বল্‌ল—সবই বুঝি, কিন্তু মানুষ আমায় মানুষের ভেতর থাক্‌তে দিলে না।

কথায় কথায় ওস্‌মান আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিল। বল্‌ল—তোমার ছেলে দু'টো কই? দেখ্‌ছি না ত'।

হঠাৎ ফালির বুকটা ছ্যাৎ করে উঠ্‌ল। বাইরের নির্জ্জীব অন্ধকারের দিকে অচেতন দৃষ্টি মেলে কি যেন খুঁজ্‌ল। যেন কতকালের সঞ্চিত ওর বুকের মানিক ওই অখণ্ড অন্ধকারের বুকে হারিয়ে গেছে। বল্‌ল—শোননি?

ওস্‌মান উৎসুক হয়ে ঘাড় নেড়ে বল্‌ল—না, শুনিনি ত' কিছু।

ফালি ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—সেই যে সে বাড়ী থেকে তোমরা যেদিন উঠে চলে গেলে, ঠিক তার হপ্তাখানেক পর একদিন বড় ছেলেটা ভেদ-বমি কর্‌তে কর্‌তে কাবার হয়ে গেল—তার দিন দুই পর ছোট্‌কাটাও গেল অমনি কাৎরিয়ে কাৎরিয়ে।—বল্‌তে বল্‌লে ওর কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে আস্‌ল।

ওস্‌মানের মনে পড়্‌ল—ধানপুকুরে থাক্‌তে তারি সাম্‌নে একদিন ছেলে দু'টিকে দু'টি চড় বসিয়ে দিয়ে ফালি বলেছিল—'কপাল পোড়া কোথাকার, তোদের কি মরণ নেই? তোদের জন্যেই ত' আমার যত মুস্কিল, নইলে যেদিকে দু'চোখ যেত বেরিয়ে যেতুম।' তাই বুঝি ফালি বেরিয়ে এসেছে?

ওস্‌মানের মনটা হঠাৎ আর্দ্র হয়ে আস্‌ল।

খানিকক্ষণ দু'জনেই এমনি নিস্তব্ধ নির্ব্বাক।

হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে একজন পুরুষ এসে ঘরে ঢুক্‌ল। হাতে একটি দিশি মদের বোতল। বয়স আর এমন কি হবে, বড়জোর চল্লিশের সীমায় পা দিয়েছে, কিম্বা হয়ত চল্লিশ টপ্‌কে গেছে। এককালে লোকটির স্বাস্থ্য যে ভালো ছিল তা শরীরের গড়ন দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু এখন একেবারেই চটুকে গেছে। হয়ত বয়সের চাপে, হয়ত প্রবৃত্তির আবিলতায়।

ওস্‌মানকে দেখে লোক্‌টি একটু খুসী হয়েই উঠ্‌ল। মনে

কর্‌ল, বহুদিন পর ফালি একটি ভালো শিকার বাগিয়েছে যা-হোক্। জড়িত কণ্ঠে বল্‌ল—দে ত' তোর কাছে কী আছে, ফালি! দোকানটা এখনো বন্ধ হয়নি—একটি পাইট নিয়ে আসি।

ফালি আঁৎকে উঠ্‌ল—কী আবার থাক্‌বে? এক আধ্‌লাও নেই আমার কাছে। যাও, এখন যাও।

হি হি করে হেসে, লাল লাল বিশ্রী দাঁতগুলো বের করে' লোকটা বল্‌ল—না মাইরি, নেশা চটাস্‌নে। দে, বার কর্।

ওস্‌মান না থাক্‌লে হয়ত কোন আপত্তির কারণ হ'ত না। কিন্তু ওস্‌মানের সাম্‌নে ওর সাথে কথা বল্‌তে লজ্জায় ফালি যেন গুটিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

ফালি মিনতি করে' বল্‌ল—তোমার পায়ে পড়ি, আজ মাফ্ করো, এখন যাও। দেখ্‌ছ না আমার ভাই এসেছে।

লোকটির গায়ে কে যেন কয়েকখণ্ড জলন্ত অঙ্গার ছুড়ে মার্‌ল। মুখখানা অত্যন্ত কদাকার করে' বল্‌ল—ভাই, না ভাতার? 'এখন যাও, এখন যাও' বল্‌লেই হ'ল আর কি!

এ পথে পা দেবার আগে এ ধরণের কুৎসিৎ কথা আর একটি এমনি লালসাতুর মানুষের কাছে ফালি বহুদিন বহুবার শুনেছে। শুনে শুনে এখন একরকম গা-সওয়া হয়ে গেছে ওর। কিন্তু আজ কি কারণে জানি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ল না।

ফট্ করে বলে উঠ্‌ল—যাও, বেরোও আমার ঘর থেকে। বেরোও বল্‌ছি।

লোকটি তেমনি প্রতিধ্বনি করে বল্‌ল—বেরুচ্ছি।—বলেই হাতের মদের বোতলটা দিয়ে ফালির মাথায় বসিয়ে দিল এক বাড়ি।

ফালি করুণ আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল ঃ

—ও মাগো!

সঙ্গে সঙ্গেই লুটিয়ে পড়্‌ল একেবারে মেঝের ওপর। দর্ দর্ ক'রে রক্ত ঝর্‌তে লাগল।

মুহূর্ত্তে কোথা হ'তে কি যেন একটা হয়ে গেল। ওস্‌মানের পরুষ দেহটা যেন হঠাৎ নাড়া দিয়ে সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। চট্ করে এক থাবায় লোকটির হাতের কব্জি ধরে ফেলে মুখের ওপর দু'তিনটা ঘুষি মেরে বস্‌ল। তারপর পরুষ কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—অসভ্য, নুইসেন্স কোথাকার!

লোকটি একটি টাল্ খেয়ে, ওস্‌মানের দিকে রুখে আস্‌তেই—ওস্‌মান ওর বুকে একটি লাথি বসিয়ে দিল। পলকে লোকটি ছিট্‌কে গিয়ে পড়্‌ল ফালির গায়ের ওপর। ওস্‌মান কি ভেবে ঘর থেকে বেরিয়েই ছুট্ দিল।

খানিক দূর আস্‌তেই ওস্‌মানের মনে পড়্‌ল—সুটকেস্‌খানা ফালির ঘরে ফেলে এসেছে। মনটা ভারি রুক্ষ হয়ে উঠেছিল,

সে আর ফির্‌ল না। আগামীকাল দিনের বেলা একবার এসে না হয় নিয়ে যাবে, এই মনে করে' চাঁপাতলার দিকে পথ ধর্‌ল।

কিন্তু চাঁপাতলায় ত' আর একা করিম মাষ্টার বাস করেন না? আরো ত' মানুষের ঘর-বাড়ী আছে। রাত্রির এই অন্ধকারে কোথায় যেয়ে সুফিয়াকে খুঁজ্‌বে সে? অপরিচিত যায়গায় কার বাসায় যেয়ে উঠ্‌বে, আর কি বলে-ই বা পরিচয় দেবে?

এমনি ভেবে ভেবে চলার গতি তার অসল মন্থর হয়ে আস্‌ল। সুফিয়ার খোঁজে আর যাওয়া হ'ল না। সে রাত্রিটা একটা হোটেলের আশ্রয়ে কেটে গেল।

সকালে ঘুম ভাঙ্‌তেই দেখা গেল, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

চাঁপাতলার প্রথম গলিটা দক্ষিণে ছুটে গিয়ে যেখানে জিরান নিয়েছে, ঠিক সেই সীমারেখার কোণেই নজরে পড়ে চটক্‌দার একতলা একটি বাড়ী। পথের একটি ছেলেকে জিগ্‌গেস করায় ছেলেটি আঙুলের নেশানা করে ওস্‌মানকে দেখিয়ে দিল। বল্‌ল—ওই যে, ওইটি

ওস্‌মানের বুকের রক্ত তোল্‌পাড় করে উঠ্‌ল।

অনেকক্ষণ ঘোরা-ফেরা করেও সুফিয়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। ওস্‌মান ভেবে ছিল, হয়ত পথের ওপর থেকেই সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে, হয়ত হাসির ঝঙ্কার এসে ওর কাণে

কাণে কথা কইবে। হয়ত বা দেখ্‌তে পাবে—ছু'টি কোমল ঠোঁটের ফাঁকে একটি সলাজ হাসি, হয়ত ইসারা। কিম্বা হয়ত একটি অশ্রু-আনমিত মুখ।

কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। কোন সাড়া-শব্দও মিল্‌ল না। অথচ এমন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। কি জানি, যদি স্থফিয়ার বাবাই ওকে দেখে ফেলে? তা' হ'লে সে কী কর্‌বে?

ওস্‌মান যেন দিশাহারা হয়ে উঠ্‌ল।

বাড়ীটার পেছনে খানিকটা ফাঁকা যায়গা। ওস্‌মান সেখানে গিয়ে বস্‌ল। বসে বসে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

ওর স্বপ্ন যেন চুরমার হয়ে গেছে।

সূর্য্য তখন মাথার ওপর। ওস্‌মান অবশের মতো উঠে গিয়ে আবার সেখানে এসে দাঁড়াল। এবার দেখা গেল জানালার ওপরের পাট ছু'টি খোলা। স্থফিয়ার গলার আওয়াজও একবার শোনা গেল যেন। একটা রিণিঝিণি শব্দও বুঝি?

ওস্‌মানের আর তর্ সইল না। জানালার গরাদ ধরে উঁচু হয়ে উঁকি মেরে উঠ্‌ল। ওর যেন কিছুতেই হুঁস্ নেই। নিজের অজ্ঞাতেই কণ্ঠ থেকে একটা চাপা-স্বর বেরিয়ে গেল।

স্থফিয়া তখন পাশের কাম্‌রায় কি যেন একটা হাতে করে' নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে চাইতেই ছু'জনের চোখে চোখে যেন বিছ্যুৎ খেলে গেল। হয়ত এই এক মুহূর্ত্তের

মধ্যেই চোখের মৌন-ভাষায় পরস্পরের কথা হ'য়ে গেল।

স্থফিয়া হাতের একটা ইসারা দিতেই ওস্‌মান জানালা থেকে নেমে পড়্‌ল। মনে হ'ল, পাশের কাম্‌রা থেকে কে যেন স্থফিয়াকে ডাক্‌ছে।

খানিক পর স্থফিয়াকে আবার দেখা গেল। জানালার গরাদের ফাঁকে একটা হাত গলিয়ে একখণ্ড দলা-পাকানো কাগজ ওস্‌মানের গায়ের ওপর ছুড়ে মার্‌ল।

ওস্‌মান চট্‌ করে' কাগজখানা তুলে নিয়ে পথ ধর্‌ল।

বড় তাড়াতাড়ি করে' পেন্সিলে দু'লাইন লেখা। কিন্তু ওস্‌মানের কাছে ওই দু'লাইন লেখাই যেন এক বিরাট গীতি-কাব্য।

খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলের এক কাম্‌রায় বসে সে গুন্‌ গুন্‌ করে' স্থর ধর্‌ল। ওর অন্তরাত্মা যেন চোখের পলকে একটা হিল্লা পেয়ে গেছে। মন যে কোথায়, কোন প্রান্তে পাখা মেলে উড়ে যেতে চায় ওস্‌মান তা' ধর্‌তেই পারে না।

এরি ফাঁকে মা'র কথাও একবার মনে পড়্‌ল। আরো মনে পড়্‌ল—বেদনা-ক্লিষ্ট শীর্ণ একখানি মুখ। গতকাল রাত্রে সে তাকে দেখেছিল—মাথায় তার অভিশাপ, বুকে তার মৃত্যুর-পদচারণা। মাথা ফেটে রক্তে যেন নেয়ে উঠেছিল। হত-চেতনায়, নিস্তেজ দৃষ্টিতে ওস্‌মানের দিকেই তাকিয়ে ছিল

আগামীবারে সমাপ্য

সে। তাকে অমন অবস্থায় ফেলে, না বলে চলে আসা ওর ঠিক হয় নাই। ভেবে দুঃখে করুণায় মনটা আবার কাতর হয়ে উঠ্‌ল।

বেলা পড়ে এসেছে। ফালি তখন ঘরের দরজার ওপর কপাটে ঠেস্‌ দিয়ে বসে কি যেন ভাব্‌ছিল। মুখখানি বড় করুণ, বড় উদাস। ওস্‌মানকে দেখে ও যেন লজ্জায় কুঁক্‌ড়ে গেল। যেন জীবনে এই সে প্রথম প্রথম লজ্জা পেল।

ওস্‌মান বলে—মাথাটা অমন নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধেছ কেন? পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বাঁধ্‌তে পার্‌লে না? ঘা খারাপ হয়ে যাবে যে?

কাল ওস্‌মানের সাম্‌নে যে ঘটনা ঘটে গেছে, আজ তা' মনে করে' সঙ্কোচে ফালি ওর মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না। সরমে যেন ওর দু'চোখ নুইয়ে আসে। মুখ নীচু করে' বলে—তা' যাক্‌! মরণ ত' আর নেই?

ওর কথাগুলো ওস্‌মানের কাছে কেমন যেন একটু অর্থহীন ঠেকে। বলে—দাও না কাপড় বের করে', আমি না হয় বেঁধে দিই!

এই শান্ত শীতল সমবেদনায় ফালির বুকের ভেতর কাঁপুনি লেগে যায়। জবাব দিতে পারে না, হতবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে।

ওস্‌মান বলে—দেখি, কতটুকু জখম হয়েছে ?

ফালির মনে হয়, এক অবুঝ আকুলতায় ওস্‌মান যেন ওর মনটাকে টেনে ছিঁড়ে দলে পিষে একেবারে মিশ্‌মার করে' দিতে চায়। আবেগে ওর বুকটা কেঁপে ওঠে। বাধা দিয়ে বলে—না না! জখম হয়নি।

আজ ফালির এই রুক্ষ ব্যবহারের হেতু ওস্‌মান বুঝ্‌তে পারে না।

মানুষের এই মনটা যে কার ছোঁয়ায় কখন কোন্ পথে ঘুরে যায় তা' বিধাতাই জানেন শুধু।

ফালি শুধোয়—খাওয়া-দাওয়া কর্‌লে কোথায় ?

ওস্‌মান বলে—হোটেলে।

ফালির বুক থেকে অকারণ একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

দক্ষিণ পাশের ঘর থেকে একটি মেয়ে এসে বলে—কি লো ফালি, বিড়ী-টিরি খাওয়াবি নাকি ?

ফালি বলে—বিড়ী ত' নেই যামিনী।

যামিনী বলে—অমন মুখ ভার করে' আসিস্ কেন ? খাবি-

দাবি আর ফর্‌ফরিয়ে বেড়াবি। গালে হাত দিয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না, তা' বলে রাখ্‌ছি।

ওস্‌মান কৌতূহলী হয়ে মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে ভাবে :

মানুষের এই জীবনটাকে পরম পরিতৃপ্তির ভেতর বিড়ীর আগুনের মতো ফুঁকে ফুঁকে একেবারে ফাঁকা ফতুর করে' মৃত্যুর উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলাই কি জীবনের চরম সার্থকতা ?

ফালি বিরক্ত হয়ে বলে—রসিকতারও একটা সময় আছে, যামিনী !

ওর কথায় যামিনীর কাণের পাশে যেন একটা জখম হয়ে যায়। রেগে ঝন্‌ঝনিয়ে বেজে উঠে বলে—রসিকতার কি হলো শুনি ? অত বাড়িস্‌নে লো, অত বাড় বাড়িস্‌নে। কথায় ফোঁড়ন দিতে আমরাও জানি, বুঝ্‌লি ?

ফালি রুখে মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলে—তোকে ত' কেউ ডেকে আনেনি, এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচাস্‌নে। নিজের ঘর কি উড়ে গেছে নাকি ?

যামিনীর জিভ্‌ শাণিত হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে—মুখের ট্যাক্স রেখে কথা বলিস্‌, ফালি ! টের পাইয়ে দেবো তা'লে। —বলেই তার নিটোল নিভাঁজ নারী-দেহটাকে একটু মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে চল্‌তে সুরু করে। তারপর যেতে যেতে বলে—

রূপ থাকলে মাগী না জানি কী করত—পোড়া কাঠ নিয়েই এত ফুটুনি। হেঃ! কেরামতে যেন ফেটে পড়ে—

এবার ফালির প্রতি ওস্‌মানের মন খাপ্পা হয়ে ওঠে। মনে মনে বলে—কী দজ্জাল ঝগ্‌ড়াটে মেয়ে! কথায় কথায় মানুষের সাথে লেপ্‌টে যায়। জীবনের গতি-পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে ফালির মেজাজও বদ্‌লে গেছে নাকি?

ফালি যেন ওস্‌মানের মুখের ভাষা পড়্‌তে জানে। বলে—কী ভাব্‌ছ, ওস্‌মান?

ওস্‌মান যেন একটু তাচ্ছিল্য ভাবেই উত্তর দেয়—কিছু না!

—হয়ত ভাব্‌ছ—দিব্যি আছি, কেমন?—বলেই ফালি একটু নড়েচড়ে বসার ভঙ্গীটা পরিবর্ত্তন করে' নেয়।

ওস্‌মান নির্ব্বিকার ভাবে বলে—হবেও বা।

ওস্‌মানের কথার এই রূঢ় ভঙ্গী দেখে ফালি বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যায়।

ওস্‌মান বলে—ঘর থেকে পা বাড়াবার সময় একটু ভেবে নেওয়া উচিত ছিল, ফালি!

কথাগুলো যেন তীরের মতো এসে ফালির বুকে বিঁধে। ফালি আঁৎকে উঠে বলে—জীবনের আদ্যিকাল থেকে খালি ভেবেই এলুম। আর অতকরে' ভেবেছি বলেই ত' এতদূরে এসে গড়িয়ে পড়েছি। মনে হয়, একটু কম করে' ভাব্‌লে,

একটু ভুল করলে হয়ত বেঁচে যেতুম। হয়ত একটা হিল্লা হয়ে যেতো আমার।—বল্‌তে বল্‌তে ফালির চোখ দুটি উদাস হয়ে ওঠে।

একটা অতর্কিত বিস্ময়ে ওস্‌মানের চোখ দু'টিও ক্ষণকালের জন্য বড়ো হয়ে ওঠে। তেম্‌নি দু'চোখ প্রসারিত করে' ফালির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

ফালিকে এত কথা শিখালো কে? সামান্য একটা কথাকে আগে যে গুছিয়ে বল্‌তে হাঁপিয়ে উঠ্‌ত, আজ সেই ফালি অভিজ্ঞতার কম্পাস্‌ দিয়ে, যুক্তি দিয়ে সংসারের এই জটিল জঘন্য অবস্থাটাকে যেন সহজ সরল করেই বুঝিয়ে দিতে পারে।
ওস্‌মান কি ভেবে হঠাৎ বলে ওঠে—তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে ফালি, চার বছর আগের এমনি একটি দিনের কথা আজ যেন কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে।

ফালি শান্ত কণ্ঠে বলে—কী সে কথা?

ওস্‌মান চৈত্রের আকাশ-ফাটা রোদের মতো স্পষ্ট ও রুক্ষ হয়ে বলে—তুমি আমাদের বাড়ী আস্‌তে বলে তোমার স্বামী তার জন্য তোমার ওপর কত অত্যাচার করৃত, গালাগাল দিত—মনে আছে তোমার?

ফালি চঞ্চল হয়ে বলে—হ্যা, বলে যাও।

ওস্‌মান কণ্ঠটাকে আরো ধারালো করে' নিজে আরো তীক্ষ্ণ

প্রচণ্ড হয়ে বলে ফেলে—সেদিন ওকে ভেবেছিলুম, লোকটা কী হৃদয়হীন, কিন্তু আজ সে ভুল ভেঙে গেল আমার। আজ দেখ্‌ছি ওরই কথা সত্য। আসলে তুমি যা তাই। পূর্ব্বেও যা' ছিলে এখনো তাই আছ, পার্থক্য শুধু একটা আঙিনার, একটা সীমানার। অবশ্যি সে সীমানা তুমি নিজেই ভেঙে টপ্‌কে এসেছ। দুঃখিত হয়ো না ফালি, এ অতি সত্য কথা।

এই জবাইখানায় এসে ওস্‌মানও কসাই সেজে বসেছে নাকি? ফালির ইচ্ছা হয়, চীৎকার করে' উঠ্‌বার কিন্তু কণ্ঠটা আপনা থেকেই বুজে আসে। উদ্যত অশ্রু সাম্‌লে নিয়ে দু'তিনবার গলাটা খাঁক্‌রে তারপর বল্‌তে আরম্ভ করে—এই কী সত্য কথা? সত্য কথার কী জানো তোমরা, ওস্‌মান! ঘরে থাক্‌তে আগে যে আমি কী ছিলুম, সে সত্যটা শুধু আমিই জানি। জীবনে একজনকে আশ্রয় করে' দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে মেয়েদের যে কী সুখ, কী সার্থকতা তা তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌বে না—ওইটুকুর জন্যেই মেয়েরা সংসারের সমস্ত জুলুম যন্ত্রনা সইতে পারে, লাথি ঝ্যাটা খেয়েও কোনমতে জীবনের মেয়াদ কাটিয়ে দিতে পারে—কিন্তু কি জানো ওস্‌মান, যখন ওই আশ্রয়টুকু স্বেচ্ছায় দূরে সরে যায়, তখন আর ওরা দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না—আছ্‌ড়ে পড়ে—তারি ভেতর সেই টাল্ সাম্‌লাতে না পেরে কেউ হয়ত পড়ে একটু সাম্‌নে, কেউ হয়ত পড়ে বহু দূরে। ধরো, সেই আশ্রয়-

হীন হয়ে ছিটুকে আমিই যদি আজ এই বিশ্রী ডোবার মধ্যে এসে পড়ে থাকি, তা' হলে কি-ই-বা এমন দোষের হলো আমার ?

ওস্‌মান বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ফালির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কার আকর্ষণে যেন আজ ফালির একটা উচ্ছ্বাসের-উৎস খুলে গেছে। অনর্গল বকেই চলে—স্বামীর ভালোবাসা কিম্বা দু'টো মিষ্টিকথা না পেলেও হয়ত চল্‌তে পারে, কিন্তু জীবনে যে জিনিষটা সব চাইতে বড়ো সত্য—একমুঠো ভাত আর একটু নুন, যার জন্যে মানুষ আত্মহত্যা করে, মানুষের বুকে ছুরি বসায়, সেই সত্যটুকু যখন হারিয়ে যায়, তখন বুঝ্‌লে কিনা ওস্‌মান, তখন আর বাস্তবিকই বেঁচে থাকা যায় না।—বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ ওর কণ্ঠস্বরটা কোমল হয়ে আসে।

ওস্‌মান ফালির কুন্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে যেন সহানুভূতির স্বরেই বলে—কারুর বাসায় খেটে খেতেও ত' পারতে ফালি !

একটা অস্থির ঝড়ের দাপাদাপিতে ফালির দুঃখের-সাগর যেন আজ কেঁপে উঠেছে। বলে—প্রাণান্ত চেষ্টা করেছি—কিন্তু ঠাঁই পেলুম না কোথাও। স্বামী দিলে না ভাত, দিলে শুধু কলঙ্কের বোঝা। খেটে খাবার জন্য মানুষের দুয়ারে গিয়ে উঠ্‌লুম। তারা দূর্ দূর্ করে' দিলে তাড়িয়ে। আরো বল্‌লে—'সোয়ামী

ঘরে রেখে বাড়ী বাড়ী টহল দিয়ে ফির্‌তে সরম করে না ?' পাড়ার লোক বল্‌লে—'মাগীটা গোল্লায় গেছে, ঘরে ওর মন বসে না। ঢঙ্‌ ঢঙিয়ে বেড়ায়—আস্তো ছেনাল !'—বল্‌তে বল্‌তে ফালি হঠাৎ থেমে পড়ে।

খাণিকক্ষণ দু'জনেই এমনি নিস্তব্ধ নির্ব্বাক।

ফালি গলাটা পরিষ্কার করে' আবার আরম্ভ ক'রে—সেই যে সেই তোমাদের বুড়ো বাড়ীওয়ালা, ধানপুকুরের সদ্দার—বুঝ্‌তে পার্‌লে ?

অকারণ ওস্‌মানের বুক দুলে ওঠে। উৎসুক হয়ে বলে—হ্যা।

ফালি একটা ঢোক গিলে তারপর বলে—কোন একটি কারণে সেই সদ্দার আমার ওপর ছিলেন হাড়ে হাড়ে চটা, সুযোগ পেয়ে তিনি পাড়ার ছোঁড়াদের দিলেন হুসিয়ে। বল্‌লেন—'গেরস্থ পাড়ায় এমন অনাচার, এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড কি তোদের চোখে পড়ে না ? এই পাড়া-বেড়ানী, ঢ্যাম্‌নী মাগীকে দে পাড়া থেকে ঝঁ্যাটা মেরে তাড়িয়ে।'—ফালির কণ্ঠস্বর এবার কেঁপে ওঠে। বলে—তারপর যে কাণ্ডটা হলো, তা' আর তোমাকে জানিয়ে দরকার নেই। ইচ্ছা ছিল, ঘরে বসেই নসিবের দুয়ারে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মর্‌ব কিন্তু ওরা আমায় হায়রান্‌ করে' তুল্‌লে—সে সময় ওর-ও কোন পাত্তা নেই—বরদাস্ত কর্‌তে না পেরে—।

—কথাটা অসমাপ্ত রেখেই ফালি চুপ ক'রে যায়। তারপর গলা খাঁক্‌রে বলে—ওরা আমায় যে ভাবে দেখ্‌তে চেয়েছিল, আজ ঠিক সেই ভাবেই এই জঘন্য পথটাকে আঁকড়ে ধরেছি। তিন চার বছর আগে কল্পনাও কর্‌তে পারিনি ওস্‌মান, আমার জীবনের গতিটা যে এমন শোচনীয় ভাবে উল্‌টে যাবে।

ওস্‌মানের মুখে কথা সরে না। কি যে বলা উচিত, আর কি যে না বলা অন্যায় সে তা' কিছুই ভেবে পায় না। ওর সমস্ত ব্যক্তিত্ব যেন কুঞ্চিত হয়ে গেছে।

বহুকাল পরে আজ ফালির জীবনের আকাশে যেন ঝড় উঠেছে। আজীবন সঞ্চিত অবরুদ্ধ নিঃশ্বাস যেন সহসা বুকের বাঁধন ছিঁড়ে ফেটে বিপুল বেগে বেরিয়ে আস্‌তে চায়। ফালি আবার বলে—এই সংসারে মানুষের ছোঁয়ায় মানুষ ভালোও হয় আবার মন্দও হয়—আমি যে কেন এমন হলুম তার জন্যে দায়ী কি শুধু আমি একা? একেক সময় মনে হয়, হয়ত কাজটা খুবই অন্যায় করেছি, অনুতাপও হয় কিন্তু আগেও একজনের লালসার দুয়ারে এই দেহটা তুলে দিতুম, আজ না হয় অন্য আর একজনের কাছে বিকিয়ে দিই। এইদিক দিয়ে বল্‌তে গেলে তোমার মতে—আগেও যা' ছিলুম, এখানো তাই আছি।

অন্য সময় এই কথাগুলো শুন্‌লে ওস্‌মানের কাণ দু'টি হয়ত ঝাঁ ঝাঁ করে উঠ্‌ত। কিন্তু এখন সে যেন কেমন এক রকম হয়ে

উঠেছে। ও-ত' বুঝেই উঠ্‌তে পারে না সে দিনের সেই ভেঙে-পড়া সংযতবাক বোকা মেয়েটি কেমন করে' আজ এমন অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট মানুষের মতো হয়ে উঠ্‌ল? আজ যেন ফালিকে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না, কেমন যেন একটু কষ্ট হয়।

খানিকক্ষণ ফালি চুপ করে' কি যেন ভাবে। তারপর বলে—আমার জীবনটাকে নিয়ে খোদা কি মর্ম্মান্তিক ঠাট্টাই না কর্‌লে, না ওস্‌মান? মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, মানুষের খোদা অন্ধ, নাচার।

ফালির এই কথায় খোদা হয়ত একটু সস্নেহের হাসিই হাসেন।

কিন্তু ওস্‌মানের কাণে যেন খট্‌ ক'রে একটা বাড়ি লাগে। চম্‌কে উঠে ফালির মুখের দিকে তাকায়, ফালি ক্ষেপে ওঠেনি ত'? ভাবে:

ওই অনাবৃত উদ্‌লা নীলাকাশের ওপর বিধাতা বলে যিনি আছেন—যাকে উদ্দেশ করে এই ধরণীর ক্ষুধার্ত্ত নর-নারীর সমস্ত কামনা ফরিয়াদ উর্দ্ধায়িত হচ্ছে, তিনি কি ক্ষমতাহীন নাচার?

এম্‌নি ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ ওস্‌মান বলে ওঠে—তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে ফালি! কী বল্‌ছ, যা' তা'—

ফালি যেন চেঁচিয়ে ওঠে—ঠিক্‌ বলেছি। কেন বল্‌ব

না? একশ'বার বলব। খোদা আমাকে এমন করে' ফতুর কর্‌লে কেন? কেন আমার সব কিছু কেড়ে নিলে? মানুষ কেন কর্‌লে অবিচার?—বল্‌তে বল্‌তে ফালি উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

ওস্‌মানের বুকটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। সত্যিই ত,' মানুষই আজ তাকে এ পথে আন্‌তে বাধ্য করেছে। সমাজে যারা শুধু পয়সার জোরে বড় হয়ে আছে, অশিক্ষায় অজ্ঞানতায় সমাজকে যারা আজো অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে' রেখেছে সেই সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনাহীন অন্ধ-মানুষের হাত থেকে সমাজ কবে রেহাই পাবে? কবে ঘুচ্‌বে সমাজের এই ছদ্মবেশী-নীচতা?

ওস্‌মান আর ভাব্‌তে পারে না। ব্যথিত হয়ে বলে—এ পথ ছেড়ে দিয়ে, ঘরে যেতে রাজি আছ তুমি, ফালি?

—ঘরে?—বলেই ফালি বিদ্রূপের হাসি হাসে।

ওর গলার স্বরে ওস্‌মান থতমত খেয়ে যায়।

কথার মধ্যে শ্লেষ নিয়ে ফালি বলে—যখন সমাজেরই একজন ছিলুম, তখনই একচুল ঠাঁই মিল্‌ল না, আর আজকে কিনা অমন ফুটো অচল পয়সার হবে ঠাঁই?—একটু থেমে বলে—হ্যাঁ, যাবো—তবে ঘরে নয়, মানুষের সমাজে নয়—এমন এক ঘরে যাব, সেখানে দেখ্‌লে খোদাও চম্‌কে উঠবে।

আগামীবারে সমাপ্য

ওস্‌মান শিউরে ওঠে।

এসময় আর কিছু বলা উচিত না মনে করে, ফালির উপস্থিত মনের ভাবটাকে চাপা দেবার জন্য ওস্‌মান চুপ্‌করে' থাকে। খানিক পর উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আমি আসি ফালি! আমার একটু কাজ আছে, আবার আস্‌ব খন্‌।—বলেই সে ঘর থেকে পা বাড়ায়।

ফালি নির্ব্বাক। না কয় একটা কথা, না দেখায় একটু আগ্রহ।

ওস্‌মান তখন গলিটা পেরিয়ে একেবারে বড় রাস্তাটার ওপর এসে পড়েছে।

এমন সময় পেছন থেকে ফালির হাঁক্ আসে:

—শুন্‌ছ, ও ওস্‌মান!

ওস্‌মান থেমে পড়ে।

—এই নাও, তোমার স্যুটকেসটা। তুমি এখানে আর এসো না, বুঝ্‌লে?—বলে ফালি স্যুটকেসখানা ওস্‌মানের হাতে দিয়ে মাথা নীচু করে' দাঁড়িয়ে থাকে।

ওস্‌মান নির্ব্বোধের মতো ফালির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—কেন, ফালি?

ফালির দুটি করুণ-চোখ দিয়ে তখন হু হু করে জলের ধারা নেমে আস্‌ছে। রুদ্ধ কণ্ঠটাকে নিষ্ঠুর ভাবে চিরে বলে—এম্‌নি।

আগামীবারে সমাপ্য

—বলেই ওস্‌মানের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে চল্‌তে সুরু করে।

ওস্‌মান কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দু'জনের মাঝামাঝি পথটায় একটি ঘূর্ণী-হাওয়া উঠে ঘুরে ঘুরে সব যেন অন্ধকার করে দেয়। ওস্‌মান আর চাইতে পারে না। দু'চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

ওস্‌মান যখন চাঁপাতলার সেই গলির ভেতর ঢুক্‌ল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে।

সুফিয়া জানালার কাছেই দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। খোলা বাতায়ন-পথ দিয়ে ঘরের আলো পিছ্‌লিয়ে বাইরে এসে পড়েছে। ওস্‌মান সুফিয়াকে দেখেই বার দুই গলা খাঁক্‌রাল।

সুফিয়া হেসে বল্‌ল—দাঁড়াও।—তারপর কপাট খুলে দিয়ে বল্‌ল—এসো, এ ঘরে কেউ নেই।

ওস্‌মান ঘরে ঢুক্‌তেই সুফিয়া আবার জানালা কপাট সব বন্ধ করে দিল।

ওস্‌মান ফিস্‌ ফিস্‌ করে' বল্‌ল—তোমার বাবা কোথায়?

সুফিয়া হেসে বল্‌ল—ভয় নেই, তিনি আজ বিকেলে কমলখালি গেছেন—ফির্‌তে দিন দুই দেরী হবে। এরি জন্য সন্ধ্যার পর আস্‌তে লিখেছিলুম।

—তোমার মা আছেন কোন্ ঘরে?—বলেই ওস্মান বুকটা একটু টান্ কর্ল।

ওর দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে সুফিয়া হেসে ফেল্ল। বল্ল—কুস্তিগীর্দের মতো অমন হয়ে দাঁড়িয়ে আছ যে? বোস আগে, বল্ছি।

ওস্মান একটা চেয়ারে বসে পড়্ল।

সুফিয়া অন্য একটা চেয়ার টেনে বস্তে বস্তে বল্ল—মা রান্নাঘরে আছেন, ওখান থেকে শোনা যায় না কিছু। তা ছাড়া এই বৈঠকখানায় তিনি আসেনও না।

এবার ওস্মানের মুখে হাসি ফুট্ল। বল্ল—কেমন করে' ছিলে এতদিন, সুফিয়া?

—তুমি ছিলে কেমন করে?—বলেই সুফিয়া ফিক্ করে' হেসে উঠ্ল।

ওই হাসির কাছে ওস্মান ঠিক থাক্তে পারে না। ওর মনের পাখী যেন এক অজানা সুদূরের উদ্দেশ্যে পাখা মেল্তে চায়।

ওস্মান মমতাময় স্বরে বল্ল—আস্বার দিন অমন করে' কেঁদেছিলে কেন?

সুফিয়া কোন উত্তর দিল না। একটা কুণ্ঠায় ওর ঠোঁট দু'টি শুধু কেঁপে উঠ্ল।

ওস্‌মান আবার বল্‌ল—কেমন করে' যে দিন গুলো কাটিয়েছি, ওহ্ !

সুফিয়া মুচ্‌কে হেসে বল্‌ল—কী করে এলে এদ্দূর ? খোঁজ দিলে কে ?

ওস্‌মান স্মিত মুখে বল্‌ল—সে সব তুমিই জানো। তোমার ভালোবাসাই আমায় পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

সুফিয়া ভুরু পাকিয়ে বল্‌ল—ইস্ ! আর বলো না।

ওস্‌মান কোন ভূমিকা না করে' সোজাসুজি বলে ফেল্‌ল—তুমি এম্‌নি এক রাতে বলেছিলে আমার সাথে বিড়ীর ক্যান্‌ভাসে যাবে বলে, মনে পড়ে ?

সুফিয়া চোখে বার দুই পলক মেরে বল্‌ল—হুঁ, বলেছিলুমই ত'।

—তাই আজ তোমায় নিতে এলুম।—বলেই ওস্‌মান চেয়ারটা আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে একেবারে সুফিয়ার মুখোমুখি হয়ে বস্‌ল।

সুফিয়ার চোখ দু'টি হঠাৎ বড় হয়ে উঠ্‌ল। খানিক স্তব্ধ থেকে পরে বল্‌ল—তুমিও একদিন চিঠিতে লিখেছিলে আমায় নিয়ে যাবে বলে। কেমন, লিখেছিলে না ?

ওস্‌মান অপ্রতিভ হয়ে বল্‌ল—কিন্তু তখন কোন কারণে তা' হয়ে ওঠেনি, সে সব পরে বল্‌ব।

আগামীবারে সমাপ্য

সুফিয়া ওস্‌মানের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে' রইল।

ওস্‌মান ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল—চুপ করে' থাক্‌লে চল্‌বে না, সুফিয়া! এখনই যেতে হবে তোমার, বলো যাবে কিনা? —বলেই সুফিয়ার হাত দু'টি মুঠো চেপে ধর্‌ল।

সুফিয়া কেঁপে উঠে বল্‌ল—কোথায়?

ওস্‌মানের কণ্ঠে যেন হঠাৎ কলোচ্ছ্বাস জাগ্‌ল। বল্‌ল —রাস্তার ওপর, মাঠের বুকে, নদীর ধারে যেখানে হয়। বলো, বলো যাবে কিনা?

সুফিয়া যেন একখণ্ড পোড়া কাঠের মতো—একবারে নিশ্চল, নিঃশব্দ, নিরুত্তর।

ওস্‌মান আবার বল্‌ল—আমাদের নিজেদের বন্ধন নিজেরাই বেঁধে নেবো। আমাদের ভালোবাসা পবিত্র, এতে কোন অকল্যাণই হ'তে পারে না, কিন্তু কী ভাব্‌ছ?

সুফিয়া মুখ তুলে বল্‌ল—আমি বল্‌ছিলুম—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওস্‌মান বল্‌ল—আর বল্‌বার কিছু নেই, যদি ভালোবাস তবে চলো। বিয়েটা হয়ে গেলে পর যখন ইচ্ছা বাড়ী আস্‌তে পার্‌বে। তখন আর কারুর কিছু বল্‌বার থাক্‌বে না।

এবার সুফিয়ার মন একটু সাড়া দিল। কিন্তু মুখে কিছুই বল্‌তে পার্‌ল না।

আগামীবারে সমাপ্য

ওস্‌মানের বুকের ভেতর একটা রুদ্ধ আবেগ যেন মাথা কুটে মর্‌ছে। ফের বল্‌ল—তুমি আসা অবধি এই পনেরোটা দিন শুধু ভেবেছি, শুধু তোমারই কথা ভেবেছি—তুমি যদি যেতে রাজী না হও—কোন জবরদস্তি কর্‌ব না। কিন্তু আমি আর দেশে ফিরে যাবো না, স্থফিয়া! হয়ত এই চাঁপাতলার মাটীতেই আমার কবর তৈরী হবে।—বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠ্‌ল। ওর শিথিল মুঠো থেকে স্থফিয়ার হাত দু'টিও অতর্কিতে খসে পড়্‌ল।

একটা কোমল কারুণ্যে স্থফিয়ার মন এলিয়ে আস্‌ল। চোখ দু'টিও ছল্‌ ছল্‌ করে' উঠ্‌ল বুঝি? কাপড়ের আঁচলে ওস্‌মানের দু'চোখ মুছিয়ে দিয়ে আকুল কণ্ঠে বল্‌ল—কেন অমন করছ? আমার কষ্ট লাগে না বুঝি?

ওস্‌মানের বুক জুড়িয়ে গেল যেন।

খানিক স্তব্ধ থেকে হঠাৎ স্থফিয়ার একটা হাত টেনে নিয়ে ওস্‌মান নিজের কাঁধের ওপর ফেল্‌ল। তারপর বাঁ-হাতটা ওর কাঁধের ওপর রেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ডাক্‌ল—স্থফিয়া!

স্থনিবিড় সান্নিধ্যের তাপে স্থফিয়ার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌ল। কিন্তু মুখে কথা ফুট্‌ল না।

ওস্‌মান আবার ডাক্‌ল—স্থফিয়া!

—উঁ!

—যাবে না ?

—যাবো।

ওস্‌মান নিজের চেয়ারটা আরো একটু টেনে নেবার চেষ্টা কর্‌ল। তারপর একটি মৃদু-তপ্ত মুখের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইল।

আবেশে স্থফিয়ার দু'চোখ তখন বুজে আস্‌ছিল।

ওস্‌মানের অজ্ঞাতেই ওর অবাধ্য মুখটা কিসের আকর্ষণে যেন আকৃষ্ট হ'য়ে স্থমুখের দিকে এগিয়ে চল্‌ছিল—আরো কাছে, আরো ঘন— .

এম্‌নি সময় হঠাৎ অন্দর থেকে হাঁক্ আস্‌লঃ

—কোথায় গেলি, ও স্থফিয়া !

চম্‌কে উঠে দু'জনেই দু'জনের হাত সরিয়ে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

স্থফিয়ার পা দু'টি টল্‌ছিল। নিজেকে জোর করে' সাম্‌লে নিয়ে, ওস্‌মানকে পাশের খালি কাম্‌রাটার দিকে ঠেলে দিল।

ওস্‌মান ব্যস্ত হ'য়ে বাধা দিয়ে বল্‌ল—না না, ওখানে না।

স্থফিয়া চোখ পাকিয়ে বল্‌ল—আঃ, চুপ্ করো।

ওস্‌মান রুখে উঠ্‌ল—অপমান হব নাকি এখানে থেকে।

স্থফিয়া বিব্রত হয়ে পড়্‌ল।

ওস্‌মান আর কিছু না বলে স্থফিয়াকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে

আগামীবারে সমাপ্য

গলির দিক্‌কার দরজাটা খুলে অস্থির পায়ে বেরিয়ে গেল। যাবার কালে একবার চাপা-স্বরে বলে গেল—কপাটটা ভেজিয়ে রেখো কিন্তু।

সুফিয়া টেবল্‌-ল্যাম্পটা সরিয়ে এনে আরো একটু আলো চড়িয়ে দিল। তারপর একটা বই হাতে নিয়ে কপাট খুলে বেরিয়ে এল উঠান্‌টার ওপর।

রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই সুফিয়ার মা বিকৃত স্বরে বল্‌লেন—কানে বাতাস যায় না বুঝি তোর ? কোথায় গিছ্‌লি ?

সুফিয়া গম্ভীর ভাবে বল্‌ল—কোথায় যাব আবার, ও ঘরে বসে বই পড়্‌ছিলুম।

ওর মা জ্বলন্ত উনুনটায় লাকড়ির একটা খোঁচা দিয়ে পরে ওর হাতের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—কী বই ওটা, উপন্যাস বুঝি ?

সুফিয়া নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সুফিয়ার মা একটু রূঢ় ভঙ্গীতে বল্‌লেন—ওই করেই ত' মাথাটা খেলি।—একটু দম নিয়ে বল্‌লেন—যা বড়ো ঘর থেকে পেতলের চামুচটা নিয়ে আয়—এসব ফেলে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে আমি।

কিন্তু হায়রে মানুষের মন !

চামুচ আন্‌তে যেয়ে সুফিয়া নিয়ে এল পেতলের বদ্‌নাটা।

ওর মা ত' আগুন হয়ে উঠ্‌লেন—তোর হলো কী ? কান কপাল সব খেয়ে বস্‌লি নকি ?

অন্যদিন হ'লে এ কথাটাকে সুফিয়া হয়ত হেসেই উড়িয়ে দিত কিন্তু আজ যেন কথাটা ওর মনে ফোঁড়ন দিল।

দু'চোখ কপালে তুলে ওর মা বল্লেন—বল্লুম চামুচ আন্তে তুই আনলি কিনা বদ্না, এঁ্যা ?

সুফিয়া তাড়াতাড়ি আবার বড় ঘরে ফিরে এল। ওর মনে হ'ল, বাড়ীর সকলেই যেন ওর বিরুদ্ধে কি একটা ষড়যন্ত্র আরাম্ভ করে' দিয়েছে।

চামুচটা হাতে নিয়ে বাইরে এসে নিশ্চল অন্ধকারের মধ্যে অকারণ দাঁড়িয়ে রইল।

এই অন্ধকারের বুকেই কাণ পেতে মানুষ উদার উন্মুখ হয়ে মানুষের পদধ্বনির আশায় বসে থাকে, ওই দিকে চেয়েই মানুষের মনে আবহমান কালের প্রশ্ন জাগে, ওই অন্ধকারের বুকেই মানুষ নিজের মনের খুনীকে খোঁজ করে।

এরি মাঝে পাশের বাড়ীর মানুকের মা এসে রান্নাঘরটাকে গরম করে' তুলেছে। মানুকের মা'র এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে সুফিয়া যেন খুসী হয়ে উঠ্ল।

ওদের দু'জনের আলাপ তখন খুব জমে উঠেছে।

সুফিয়া সেখান থেকে নিঃশব্দে উঠে বৈঠকখানার ভেতর ঢুকে পড়্ল।

ওর সাড়া পেয়ে ওস্মানও ওদিকের কপাট ঠেলে ভেতরে

এসে পড়্‌ল। এসেই বল্‌ল—গাড়ী ওই গলির মুখে অপেক্ষা কর্‌ছে, দেরী কর্‌লে ট্রেণ ধরা যাবে না।

সুফিয়া অবাক-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওস্‌মানের উৎসাহ-দীপ্ত দু'টি চোখের দিকে চেয়ে রইল।

ওস্‌মান ঘাব্‌ড়ে গেল। বল্‌ল—ওকি, কী ভাব্‌ছ?

সুফিয়ার চমক ভাঙ্‌ল। বল্‌ল—কই, না।

ওস্‌মান বল্‌ল—আমায় বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার, সুফিয়া?

সুফিয়া নরম আওয়াজে বল্‌ল—হ্যাং।

কয়েক মিনিট দু'জনেই চুপ করে' রইল।

পরে সুফিয়া বল্‌ল—এক্ষুনিই গাড়ী নিয়ে এলে, আমি যে কিছুই—

ওস্‌মান বাধা দিয়ে বল্‌ল—কিছুই নিতে হবে না।—হ্যা, তাড়াতাড়ি করো।

সুফিয়া একটু ভেবে নিয়ে বল্‌ল—আচ্ছা আস্‌ছি, একটু বোস।—বলেই বেরিয়ে গিয়ে কপাটে ছিকল এঁটে দিল।

খানিক পর সুফিয়া আবার ফিরে এল। ওর ডান-হাতে একটা সুটকেস্ আর বাঁ-হাতে কাপড়ের একটা পুঁটুলী।

ওস্‌মান অধীর হয়ে উঠেছিল। বল্‌ল—একি বাড়ী বদল করা হচ্ছে নাকি? ফেলে রাখো ওসব ঝঞ্ঝাট্!

স্থফিয়া মিনতি-মাখা স্বরে বল্‌ল—না, আর কিছু নেবো না, খালি এইটেই। নাও ধরো।

ওস্‌মান কপাটটা আস্তে আস্তে খুলে একবার গলিরদিকে ভালো করে' তাকিয়ে নিল। তারপর স্থটকেস্‌টা হাতে নিয়ে নীচু গলায় বল্‌ল—এসো।

স্থফিয়া বৈঠকখানার সমস্ত জিনিষগুলোর দিকে একবার স্নেহার্দ্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পা বাড়াল। ওর পা দু'টি কাঁপ্‌ছিল, চৌকাঠের কাছে আস্‌তেই কি মনে করে' ওস্‌মানের জামা টেনে ধরে ওকে থামিয়ে দিল। বল্‌ল—কপাটটা ভেজিয়ে দাঁড়াও, একটু।—বলেই টেবলের কাছে এসে অস্থির হাতে একটা কাগজে কি যেন লিখ্‌তে লাগ্‌ল।

চিঠিখানা শেষ ক'রে টেবলের ওপরই চাপা দিয়ে রেখে—দু'জনেই বেরিয়ে পড়্‌ল তারপর।

গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ফিমেল ওয়েটিং রুমের কাছে আস্‌তেই হুস্‌ হুস্‌ করে' ট্রেণ এসে প্লাটফর্‌মে দাঁড়াল।

ওস্‌মান বল্‌ল—বাঁচা গেল যা-হোক্‌! সময় মতোই এসে পড়েছি, আর পাঁচ মিনিট দেরী হ'লেই সব ওলোট পালোট হয়ে যেত।

আগামীবারে সমাপ্য

সেদিন যাত্রীর বিশেষ ভিড় ছিল না। এখানকার রাত্রির গাড়ীগুলোতে প্রায়ই এরকম হয়ে থাকে। 'চল্লিশজন বসিবেক'এর স্থলে রাত্রে চারজন শুয়েই আস্‌তে পারে। এ লাইনের কালো-আদ্‌মি গুলোর এম্‌নি সৌভাগ্য বটে!

সুফিয়াকে জেনানা কামরায় একাকিনী ছেড়ে দিতে ওস্‌মানের মনটা কঞ্জুস্‌ হয়ে উঠ্‌ল। ইণ্টারক্লাস কামরাগুলো জনহীন নিরালা দেখে ওস্‌মান সুফিয়াকে নিয়ে তারি একটিতে উঠে পড়্‌ল।

জন-কতক প্যাসেঞ্জার নাম্‌ল, জন কতক উঠ্‌ল। তারপরই বাঁশী বাজিয়ে ট্রেণ দিল ছেড়ে।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ্‌চাপ্‌। তারপর ওস্‌মান নিজেই কথা সুরু করে। বলে—বাইরের দিকে অমন করে' তাকিয়ে কী দেখ্‌ছ?

সুফিয়া হয়ত তখন ভাব্‌ছিল, ওর জীবনের এতগুলো দিন, মাস, বর্ষ যাদের সাথে কেটে গেছে, সেই বাপ্‌-মা, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত ছেড়ে—শাস্ত্রের শাসন, সমাজের কুৎসা সব কিছু পেছনে ফেলে—ভবিষ্যতের অজানা রেখাগুলোকে পা দিয়ে চট্‌কে একেবারে মুছে নিশ্চিন্ত করে'—নীড়-হারা পাখীর মতো যে অনির্দ্দেশ পথে সে পাখা মেল্‌ল তার শেষ কোথায়? রাত্রির ঘনতর অন্ধকারে? না প্রভাতের উজ্জ্বল আলোয়?

আগামীবারে সমাপ্য

মাতার কাছে রাত্রে তার জীবনের এই প্রথম অনুপস্থিতি—হয়ত ওরি অপেক্ষায় এতক্ষণ ওর মা ভাত আগ্‌লে বসে আছে, হয়ত সেই তপ্ত-ভাতের ওপর ওর মা'র চোখের জল পড়্‌ছে, হয়ত বা অন্ধকারের কালো পর্দা চিরে চিরে ওকেই খোঁজ করে' ফির্‌ছে।

ওর চোখের কোণে জল জমে ওঠে।

ওস্‌মান নম্র হয়ে ফের বলে—ওকি, কথা কইছ না যে তুমি? —বলেই সুফিয়ার কোল থেকে ওর একটি হাত তুলে নেবার জন্য নিজের হাত বাড়ায়।

হঠাৎ ওস্‌মানের হাতের ওপর টপ্‌ করে' ঝরে পড়ে একফোঁটা গরম জল।

—কী, সুফিয়া! তুমি কাঁদ্‌ছ?—ওস্‌মান চম্‌কে উঠে শুধোয়।

—না।—সুফিয়া গলা ঝেড়ে জবাব দেয়।

ওস্‌মানের মুখে আর কথা ফোটে না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে শুধু।

সুফিয়ার মনের আকাশের ফাটল্ কোথায় ওস্‌মান তা' বুঝ্‌তে চেষ্টা করে।

অনেকক্ষণ এমনি নিঃশব্দে কাটে।

তারপর ওস্‌মান সুফিয়ার মাথাটা টেনে কাৎ করে নিজের কাঁধের ওপর রাখে।

আগামীবারে সমাপ্য

ট্রেণ তেমনি দ্রুতগতিতে চলেছে। খোলা জানালাগুলো দিয়ে চঞ্চল বাতাস এসে স্থফিয়ার কপালের ভাঙা চুলগুলো উড়িয়ে নিয়ে ওস্‌মানের মুখের ওপর ফেল্‌ছিল।

ওস্‌মান স্থফিয়ার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—চিঠিতে কী লিখে রেখে এসেছ, স্থফিয়া?

স্থফিয়া কোমল স্বরে বলে—লিখেছি—ওঁরা আমার জন্যে যেন কোন চিন্তা না করেন, আমি কোথায় গেলুম তা' পরে জান্‌তে পার্‌বেন। তারপর—।—বলেই স্থফিয়া চুপ করে যায়।

ওস্‌মান হেসে বলে—থাম্‌লে কেন? বলো, তারপর?

স্থফিয়া ঠোঁট উল্‌টে বলে—তারপর আর মনে নেই ক'।

ওস্‌মান মৃদু হেসে বলে—আমি বল্‌ব?

স্থফিয়া চট্ করে' ওস্‌মানের কাঁধ থেকে মাথা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—বলো দেখি, তবে বুঝ্‌ব—হাঁ!

ওস্‌মান কথা বল্‌বার আগেই হি হি করে' হেসে ওঠে। ওর দেখাদেখি স্থফিয়ারও হাসি পায়।

আজ যেন ওদের মনের ঈদোৎসব।

খানিক এমনি হাসাহাসি চলে।

একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর ওস্‌মান বলে—বল্‌ব?—বলেই আবার হেসে ওঠে।

স্থফিয়া মুচ্‌কে হেসে বলে—বা-রে-বাঃ !

ওস্‌মান ক্ষণেকের জন্য হাসি চেপে বলে—শোন, বলি।

স্থফিয়া মাথা কাৎ করে' চোখে-মুখে হাসির ঔজ্জ্বল্য নিয়ে এক অপূর্ব্ব অপরূপ ভঙ্গীতে ওর মুখের পানে চেয়ে থাকে।

ওস্‌মান বলে—তার পরেরটুকু লিখেছ—'কারণ আমার 'উনি' আমি পেয়ে গেছি তাই—'

স্থফিয়া কথাটার মাঝখানেই বাঁকিয়ে ওঠে। বলে—ভ্যাখো, ভালো হবে না কিন্তু।

কুণ্ঠায় স্থফিয়ার কাণের গোড়া পর্য্যন্ত তখন লাল হয়ে ওঠে।

কিন্তু ওস্‌মান যেন হাসির সাথে আজ একটা রফা করে' বসেছে। হেসে হেসে মোটরের চাকার মতো ফেটে একেবারে ফেসে যেতে চায় যেন। তেম্‌নি পুলকিত হয়ে হেসে বলে—সত্য কথা শুনে সবাই অম্‌নি রাগে। তুমিই বলো সত্য কিনা ?

স্থফিয়া বলে—সত্য না, তোমার মাথা।—বলেই মুখ টিপে হাসে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে—তোমার যে কিছুই খাওয়া হলো না।

এবার ওস্‌মানের হুঁস্ হয়। তাই ত'! ওর না হয় খিদেই নেই কিন্তু স্থফিয়ার ?

মুখখানা কাঁচুমাচু করে' ও বলে—বড্ডো ভুল হয়ে গেছে,

সুফিয়া! তুমিও ত' কিছু খাওনি। নয়নপুর ইষ্টিশান্ থেকে মনে করে' যদি—।—একটু থেমে বলে—সুমুখের ইষ্টিশানেও বোধ হয় কিছু পাওয়া যাবে না।

এই বোকামির জন্য ওস্মানের বড় দুঃখ হয়।

সুফিয়া কোন উত্তর না দিয়ে পাশের বেঞ্চির ওপর থেকে ওর কাপড়ের পুঁটুলীটা তুলে নিয়ে খুল্তে বসে। তারপর খবরের কাগজে মোড়া কি একটা ওস্মানের হাতে দিয়ে বলে—তোমাকে খেতে হবে এগুলো।

ওস্মান খুলে দেখেই তাজ্জব হয়ে যায়। কতকগুলো নারকেলের লাড়ু, কয়েকটি জাম্রুল, গোটা দুই পেয়ারা। তুচ্ছ জিনিষ কিন্তু বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের সাথেও বোধ করি এগুলোর তুলনা হয় না।

কথায় স্নেহ ঢেলে সুফিয়া বলে—নার্কেলের এই লাড়ুগুলো আমি করেছি, আর ওসব আমাদের গাছের। তুমি লক্ষ্য করোনি?—আমাদের বাড়ীর পেছনে কত রকম গাছ—জামরুল, পেয়ারা, কদম, কামরাঙা।

ওস্মান ন্যাকামো করে' বলে—কই, আমি দেখিনি ত'!

দ্যাখোনি? আশ্চর্য্য!—সুফিয়া একটু আশ্চর্য্য হয়েই বলে।

ওর কথার ভঙ্গীতে ওস্মানের হাসি পায়। ওদের ছোট বাগানটি যেন দুনিয়া শুদ্ধ মানুষের কল্পনার লীলাভূমি।

ওস্‌মান বলে—নাও, তুমিও নাও। আমি বুঝি একা একা খাবো ?

সুফিয়া বলে—আমি ভাত খেয়ে এসেছি, এখন আর কিছুই খেতে পার্‌ব না।

ওস্‌মান বলে—তবে রইল, আমিও খাবো না।

সুফিয়া আহ্লাদের সুরে বলে—না, খেতে হবে তোমাকে। —বলেই কয়েকটা লাড্ডু ওস্‌মানের হাতে তুলে দেয়।

ওস্‌মান আর আপত্তি কর্‌তে পারে না। টপ্‌ করে একটা মুখের ভেতর ফেলে।

সুফিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কি এক অপার্ব মায়ায় ওর ডাগর দু'টি চোখ ঢুলে আসে।

ওস্‌মান সুফিয়ার একটা হাত চেপে ধরে বলে—দেখি, হা করো ত' ?

সুফিয়া বলে—না, হাতে দাও।

ওস্‌মান বলে—আমায় ঘেন্না করো বুঝি ?

সুফিয়া আর উত্তর দিতে পারে না। মাথা নীচু করে' বসে থাকে।

ওস্‌মান বাঁ-হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে জোর করেই ওর মুখের ভেতর একটা লাড্ডু গুঁজে দেয়।

কি জানি কেন সুফিয়ার সমস্ত শরীর আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

আগামীবারে সমাপ্য

খানিকপর ওস্‌মান বলে—এবার নিজের হাতে নিয়ে খাও।

সুফিয়া কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ ট্রেণের বাঁশী বেজে ওঠে।

ওস্‌মান বলে—ইষ্টিশানে এল বুঝি?—বলেই জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দূরের দিকে তাকায়। তারপর বলে—হ্যা, ওই যে বাতি দেখা যাচ্ছে।

খোপ্‌রির মতো ছোট্ট ইষ্টিশান্। গাড়ী একটু থেমেই আবার ছেড়ে দেয়।

ওস্‌মান হেসে বলে—যাক্, আমাদের ভাগ্য ভালোই বল্‌তে হবে। এ পর্য্যন্ত ইন্‌টারক্লাসের একটি প্যাসেঞ্জারের সাথেও মোলাকাত হয়নি।

উত্তরে সুফিয়া শুধু মৃদু মৃদু হাসে।

ওস্‌মান বলে—ঘুম পেয়েছে, সুফিয়া? রাত অনেক হয়ে গেছে, একটু শোও—নইলে অসুখ করবে তোমার।

সুফিয়া অঙ্গমোড়া দিয়ে, হাতের বুড়ো আঙুল্ দু'টি ফুটিয়ে তারপর অলস ভঙ্গীতে বলে—না, আমার ঘুম পাচ্ছে না।

ওস্‌মান রসিকতা করে' বলে—তবে আমি ঘুমোই তুমি বরং বসে খানিক পাহারা দাও, কেমন?

সুফিয়া ত' হেসেই অস্থির। বলে—আজকাল ত' খুব কথা শিখেছ দেখ্‌ছি!

আগামীবারে সমাপ্য

আহ্লাদে টলমল্ হয়ে ওস্মান বলে—শিখ্‌ব না, মাগ্‌না নাকি? শিখাবার মানুষ থাকলেই শিখে।—বলেই সুফিয়ার কোলের ওপর মাথা রেখে লম্বা হয়ে পড়ে।

সুফিয়া হেসে বলে—বাড়ী যেয়ে মাকে কি বল্‌বে?

ওস্মান বলে—মাকে এখন কিছুই বল্‌ব না। পঁয়তাল্লিশ নম্বর কাজী লেনে আমাদের এক আত্মীয় বাড়ী আছে, সেখানে গিয়ে উঠ্‌ব এখন। তারপর অবস্থা বুঝে যা' হয় করা যাবে পরে।

সুফিয়া বলে—ওঁদের কাছে কি বলে পরিচয় দেবে আমার? —বলেই মুখ টিপে হাসে।

ওস্মান সাধারণ ভাবে বলে—ও-বাড়ীতে থাকার মধ্যে কেবল এক বুড়ী আছে, দূর সম্পর্কে আমার খালা হয়—ওকে যা' বল্‌ব তাই বুঝ্‌বে।—বলেই একটু চুপ করে কি যেন ভাবে। তারপর হেসে বলে—তা' পরিচয়ের জন্য ভাব্‌তে হবে না মোটেই।

সুফিয়া গম্ভীর ভাবে বলে—ভাব্‌তে হবে না মানে?

ওস্মান হেসে ফাজ্‌লামো করে' বলে—মানে একেবারে সহজ, বাস্তব পৃথিবীর মতো স্পষ্ট। অর্থাৎ এমন একটি রঙিন সাইনবোর্ড সাথে নিয়ে মানুষের দুয়ারে দাঁড়ালে আর মুখ ফুটে বলে দিতে হয় না—যে ইনি আমার—

এবার দু'জনেই হেসে ওঠে।

আগামীবারে সমাপ্য

কিন্তু কথা যেন ওদের আর শেষ হ'তে চায় না। তা' না হোক্, তাতে দুঃখ নেই আপনার, আমার এবং অন্য কারুর।

ভোর হ'তে না হ'তেই নগরবাড়ী ইষ্টিশানে ট্রেণ এসে পৌঁছ্‌ল।

ওস্‌মান বল্‌ল—চাদরটা ভালো করে' গায় জড়িয়ে নাও, সুফিয়া! নাব্‌তে হবে এখন।

সুফিয়া হেসে বল্‌ল—আচ্ছা থাক্, তা' আর বল্‌তে হবে না হুজুরকে।—বলেই কাশী-সিল্কের চাদরটা সুন্দর করে' গায় জড়িয়ে নিয়ে মুখের ওপর ঘোম্‌টার যবনিকা টেনে দিল।

সমস্ত প্যাসেঞ্জার নেমে যাবার পর, ওস্‌মান সুফিয়াকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে এসে উঠ্‌ল।

গাড়ীর খড়খড়ি দিয়ে এক টুক্‌রো লাল রোদ সুফিয়ার মুখের ওপর এসে পড়েছিল। ওস্‌মান সস্নেহ-দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু সুফিয়ার মনের নারীটি আবার কাতর হয়ে উঠ্‌ল। মনে পড়্‌ল, প্রতিটি দিনের মতো আজ আর তার মা এসে তার ঘুম ভাঙায়নি, নাশ্‌তা খেতে ডাকেনি। আরো মনে পড়্‌ল, ওর

মা হয়ত এখনো রান্নাঘরের দাওয়ায় তেমনি বসে বসে কাঁদ্ছে, হয়ত এখনো ওর আশায় নাশ্তা নিয়ে বসে আছে।

এম্নি অসংখ্য কথা ওর মনে পড়্তে লাগ্ল।

অনেকক্ষণ পর গাড়ী এসে কাজী লেনের সেই পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাড়ীটার দরজার কাছে দাঁড়াল।

ঘা দিতেই বুড়ী এসে দরজা খুলে দিল। ওস্মান চোখে মুখে হাসি নিয়ে বল্ল—কেমন আছ, খালা? আমাদের কথা ভুলে যাওনি ত'?

কিন্তু উত্তর দেবে কে? ওর খালা যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল। তার এই দুঃসময় এ আবার কি উৎপাত, মরণের যায়গা কি আর কোথাও পেল না?

বুড়ীর মুখভাব লক্ষ্য করে' ওস্মান বল্ল—চলো, ভেতরে চলো, বল্ছি সব।

এবার বুড়ীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়্ল। সে-ই খেতে পায় না, তার ওপর এই আবাগির বেটা এসে ওরই ঘাড়ে চাপ্ল কোন্ আক্কেলে? ভারি ত' খালাগিরি ফলাতে এসেছে এখানে।

গভীর অস্বস্তিতে বুড়ীর সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলে উঠ্ল। মুখখানা তেমনি কালো করে' বলে ফেল্ল—তা' বাপু এমন সময় এলে—। —বলেই থেমে পড়্ল। তারপর বল্ল—এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে?

ওস্‌মান হেসে উঠ্‌ল। বল্‌ল—তোমাদের এখানেই এসেছি।

বুড়ীর ঘোলা চোখ দু'টি কপালে উঠ্‌ল। কিন্তু মুখে কিছু বল্‌ল না।

ওস্‌মান প্রসন্ন মুখে বল্‌ল—তাড়াতাড়ির জন্যে বিয়ের সময় তোমায় খবর দিতে পারিনি, তাই ওকে নিয়ে এলুম দেখাতে। —বলেই সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

সুফিয়া বুঝ্‌তে পেরে বুড়ীকে সালাম কর্‌ল। বুড়ীও আশীর্ব্বাদ করে' বল্‌ল—বেঁচে থাকো মা!

ওস্‌মান আস্তে আস্তে বল্‌তে লাগ্‌ল—মনটা বড্ডো ঘাব্‌ড়িয়ে উঠ্‌ছিল কিনা, তাই মনে কর্‌লুম, যাই খালার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসি। আমাদের ত' আর কোন আত্মীয় স্বজন নেই!

কথাগুলো বুড়ীর কাছে বড় ভালো লাগ্‌ল না।

ওস্‌মান কি একটু ভেবে নিয়ে ফের বল্‌ল—বুঝ্‌লে খালা? আমরা দিন দুই তোমার এখানে থাক্‌ব। তুমি লজ্জা করো না, তোমার অবস্থা ত' সবই জানি—কি কি আন্‌তে হবে বলো, আমি সব কিনে নিয়ে আস্‌ছি।

বুড়ী যেন এবার বুকে বল পেল। এতক্ষণ পর ফোঁক্‌লা-দাঁতে হেসে বল্‌ল—তা' বাপু দু'দিন না দশদিনই থাক্‌লি। তোরা হলি আমার আপন লোক—এ ঘর-দোর ত' তোদেরই। তা' তোর মাকে নিয়ে এলি না কেন? কতকাল দেখিনি, আহা!

আগামীবারে সমাপ্য

ওস্‌মান হেসে বল্‌ল—নিয়ে আস্‌ব আরেক্‌বার।

এককালে এই বুড়ীর সবই ছিল, কিন্তু এখন কিছুই নেই—থাকার মধ্যে এই পুরোণো বালি-খসা একতালা বাড়ীটা বিগত দিনের সাক্ষীর মতো খাড়া হয়ে আছে। বুড়ীর জীবনের ভিত্তির সাথে সাথে বাড়ীটার ভিত্তিও ধসে চলেছে। একদিন হয়ত এই স্মৃতিটুকুও আর থাক্‌বে না।

কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। ওস্‌মান বল্‌ল—আমি বাজার থেকে ঘুরে আস্‌ছি, খালা! তোমরা এদিকে সব ঠিক্ করো।—বলেই ওস্‌মান বেরিয়ে গেল। যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে একবার সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌ল।

বুকভরা তার উচ্ছল উদ্যম, চোখভরা তার উজ্জ্বল হাসি। বেঁচে থাকার সার্থকতা নিয়ে মন যেন বসন্তোৎসবে মেতে উঠেছে। নিরুপায় নিরুদ্যম একঘেঁয়ে জীবনের দিনগুলো যে-পৃথিবীর বুকে রেখা টেনে গেছে—এ-ত' সেই নিষ্ফলতার পৃথিবী নয়। গল্প-লোকের রাজকন্যাকে স্বপ্নে দেখার মতো আজ যেন পৃথিবীর কোথায় একটা মোহ আছে, একটা ছন্দ আছে—যে ছন্দে মানুষ নিজের খেলাঘর রচনা করে, মেঘের সাথে মেঘের জড়াজড়ি হয়। এই পৃথিবীর এত রূপ, এত গান কোথায় ছিল এতকাল? ওস্‌মান যেন জেগে উঠে নিজের ভেতর নিজের সমগ্র রূপটি দেখতে পেল।

আজ ওস্‌মানের চেহারা যেন ওর মনের কথা কয়। যৌবনের পুলকোচ্ছ্বাস যেন সর্ব্ব-অবয়ব ফেটে পড়ে।

বাজার থেকে ফিরে এসে ওস্‌মান আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এরি মাঝে স্থফিয়া বুড়ীকে একেবারে সম্মোহিত করে' ফেলেছে। বুড়ী বল্‌ল—অমন ঘর-জোড়া লখ্‌খি্য বৌ নসিব গুণে মেলে বাপু! বৌ ত' নয়, যেন ঘরের চেরাগ। আহা, কাজের ছিরি দেখে বুক ঠাণ্ডা! খালি ছুরত্‌ থাক্‌লেই হয় না—তোর যুগ্যি বৌ পেয়েছিস্‌।—একটু থেমে বল্‌ল—আমার রমজানটাকে যদি এম্‌নি একটা বাঁধন দিয়ে দিতে পারতুম!—বলেই একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌ল।

স্থফিয়া ওস্‌মানের দিকেই তাকিয়ে ছিল, চোখ পড়্‌তেই ও ঠোঁট মুচ্‌কে একটু হাস্‌ল। এ হাসির অর্থ কল্পনার-অভিধানে নেই। কাজেই স্বচক্ষে না দেখ্‌লে বোঝানো যাবে না।

ওস্‌মান বল্‌ল—তাড়াতাড়ি করে' নামিয়ে নাও, খালা! কুলী যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ী হাতটা চঞ্চল করে' বল্‌ল—এই ত' দিচ্ছি খালি করে'। যা-ই বলো বৌ, ওস্‌মানের আমার নজর আছে। কোনো জিনিষই বাদ দেয়নি, হেঁ হেঁ—

খুসীতে বুড়ী যেন চ্যাঙারীটার ওপর উছ্‌লে পড়্‌তে চায়।

সুফিয়া পাকা-ঘরণীর মতো উঠানটা ঝাঁট্ দিয়ে বাট্না বাট্তে বস্ল।

বুড়ী চেঁচিয়ে উঠ্ল—ওমা, ওকি কচ্ছ? রাখো তুমি, আমি বেটে দেবো। দু'দিনের জন্য মেহ্মান এসেছ, তুমি কেন ওসব কর্বে?

বড় মুখ-ফোঁড় এই সুফিয়া! কথা বল্বার কারণ পেলে ও যেন আর চুপ্ থাক্তে পারে না। নিঃসঙ্কোচে বল্ল—সেকি খালাআম্মা এই না আম্মি বল্লেন—ঘর-দোর সব আমাদের? তবে আবার মেহ্মান হলুম কোত্থেকে?

নিজের কথার গুরুত্ব সম্বন্ধে বুড়ী একেবারেই অচেতন। খুসী হয়েই বল্ল—বেশ মা, বেশ! তুমিই সব ঠিক্-ঠাক্ করে' নাও। তোমরা ত' আর পর নও, যে কথা হবে!

ওদের ভেতর আলাপটা বেশ জমে উঠেছিল। এমন সময় রমজান এসে উঠানটার ওপর দাঁড়াল। বয়স আঠারো চলে গিয়ে কুড়ির দিকে পা দিয়েছে। ছিপ্ছিপে গড়ন, পরনে দাবার ঘরের মতো ছক্কাটা বিচিত্র রঙের তবন, গায়ে গোলাপী রঙের গেঞ্জি, মাথায় টেরি, চুলগুলোর দিকে চাইলে পদ্মার ঢেউয়ের কথা মনে পড়ে। এক কথায় বল্তে গেলে—ও যেন একটি আস্তো নাগর।

দু'বেলা দু'মুঠো রাঁধা ভাত খায়, আর মানুষের বাড়ীর

রোয়াকে বসে তাস্ পেটে, বিড়ী ফুঁকে, তাড়ি খায়, সঙ্গী জুটলে গলি গলি হাওয়াও খেতে যায়। আরো গুণ আছে, কিন্তু সে বেফাঁস কথাটা এখানে না বলাই ভালো।

এই হ'ল তার জীবন-নাট্যের একটা মামুলি পরিচয়-লিপি।

বুড়ী বল্‌ল—রমজান নাকিরে?

রমজান বল্‌ল—হ্যা।

সুফিয়া ওকে দেখেই মাথার কাপড়টা টেনে সেখান থেকে উঠে যাচ্ছিল। বুড়ী বাধা দিয়ে বল্‌ল—পালাচ্ছ কেন মা, আমাদের রমজান ত'। বোস, বোস। আমার বড় বোন মারা যাবার পর থেকে ছেলেটা আমার কাছেই আছে। কই গেলি, ওরে রমজান! ওকে চিনিস্‌নে তোর—ভাই যে, আর এইটে তোর ভাবি।

রমজান কোন উত্তর না দিয়ে বসে পড়্‌ল।

রমজানের দিকে চেয়ে ওস্‌মানের মনটা অকারণ ক্ষেপে উঠেছিল। ওকে ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখেছে বলে ওর মনে হ'ল না।

দক্ষিণ দিক্‌কার বারান্দাওয়ালা ঘরখানায় ওস্‌মানদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওস্‌মান সেখান থেকে উঠে ওই ঘরে গিয়ে বস্‌ল। বিছানার ওপর বসে ওর মনে হ'ল, এই ঘরখানার কোথায় যেন একটা সুনিবিড় মমতার আভাষ আছে।

আগামীবারে সমাপ্য

স্থফিয়া যেন পৃথিবীর ললাটের একটি টিপ্। ওস্‌মান স্থফিয়াকে নিয়ে কত ভাবেই না কল্পনায় অনুরঞ্জিত করে।

রান্নাঘর থেকে চুড়ির ঝুণুর-ঝুণু শব্দ এসে কাণে কাণে কথা কয়ে যায়। ওই দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয়, কে যেন হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকে।

বুড়ী একটু চোখের আড়াল হতেই চট্ করে' স্থফিয়া উঠে এসে জানালার ফাঁক দিয়ে ওস্‌মানের গায়ে জলের ছিটা দেয়। ওস্‌মান ছুটে গিয়ে ওর দু'টি হাত ধরে ওকে ঘরের ভেতর টেনে আনে।

স্থফিয়া হেসে গলে' পড়ে। ঘাড় বাঁকিয়ে বলে—কী চালাক্, গুছিয়ে-গাছিয়ে পরিচয়টা দিয়েছে।

ওস্‌মান ওর দু'হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বলে—কী চালাকী কর্‌লুম?

—মাগো! হাত নয়, যেন লোহা। ছাড়ো শীগ্‌গির্, বড্ডো লাগ্‌ছে।—বলেই স্থফিয়া হাত দু'টি জোর করে' ছাড়িয়ে নিতে চায়।

ওস্‌মান একটা হাত ছেড়ে দিয়ে অন্যটি মুঠো চেপে রাখে।

হেসে বলে—বৌকে বৌ বলে পরিচয় দেওয়াটার মানে বুঝি চালাকী ?

স্থফিয়া ঘাড় দুলিয়ে হেসে বলে—ইস্! চাকুরী না হ'তেই ট্র্যান্স্ফার—

ওস্মান বলে—মনের বিয়ে ত' আমাদের অনেক আগেই হয়ে গেছে, এখন শুধু—

—কোথায় গেলে, ওগো বৌ!—রান্নাঘর থেকে বুড়ী হেঁকে বলে।—যাঃ, সব তরকারিই পুড়ে গেল।

স্থফিয়া তাড়াতাড়ি যেয়ে হাজির হয়। কাতর হয়ে বলে—স্থটকেস্ থেকে ওর জামাটা বের করে' দিতে গিছ্লুম।

রমজানটা বুড়ীর ঘরের ভেতর বসে ছিল, এতক্ষণ পর কথা বলার স্থযোগ পেয়ে বেরিয়ে আসে। বলে—ভাবি যে ছুটোছুটি করে' তরকারি ত' পুড়্বেই।

ওর কথা শুনে লজ্জায় স্থফিয়ার দু'চোখ নত হয়ে আসে।

রমজান দম্বার পাত্র নয়। বলে—ভাবির যেন সাত চড়েও মুখে রা' নেই। কি ভাবি, তুমি বুঝি চোখে কথা কও ?

স্থফিয়ার গা সির্ সির্ করে ওঠে। ইচ্ছা হয়, উনুনের জলন্ত লাক্‌ড়িটা ওর ছুঁচো-মুখটার ভেতর ঢুকিয়ে দিতে।

বুড়ী ধমক দিয়ে বলে—যা, পাজি! ও লজ্জা পায়, দু'দিন পর আপনিই কথা বল্‌বে।—বুঝলে বৌ? এই হতভাগাটা

এম্‌নি, কাউকে পর বলে কোনদিন ভাব্‌তে পারে না। বাপ্‌ মা মরা ছেলে কিনা ? একটু আদর পেলে আর কথাটি নেই।

রমজান আর কিছু না বলে আবার ঘরের ভেতর চলে যায়।

সেদিনটা কি আনন্দেই না কাটে। এই আনন্দের ভেতর সুফিয়ার জীবন যেন শোভায় সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছে।

শরতের প্রথম পদক্ষেপের রাত্রি—

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে তখন। চৌকিটার ওপর পাশাপাশি বসে দু'জনের আলাপ সুরু হয়।

ওস্‌মান বলে—আচ্ছা, সুফিয়া! ধরো আজ যদি আমরা মনে করি যে—দু'মাস আগে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, আমরা প্রতিটি দিনের মতো আজো স্বামী-স্ত্রী তেমনি ঘেঁষাঘেঁষি করে' বসে আছি, হয়ত বা পাশাপাশি শুয়েই আছি—তা' হলে মনে কী স্ফূর্ত্তিই না হয়, না ?

খোলা জানালা দিয়ে ফুর্‌ ফুরিয়ে হাওয়া আস্‌ছিল। তবু কেন জানি সুফিয়ার মুখটা ঘেমে ওঠে। কাপড়ের আঁচলে ঘাম মুছে খানিক স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবে।

সুফিয়াকে নিরুত্তর দেখে ওস্‌মান নিজেই আবার বলে—আজ ত' যাওয়া হ'ল না আমার, সুফিয়া! কাল বাড়ী থেকে ঘুরে এসে তারপর তোমায় মা'র কাছে নিয়ে যাবো। কিন্তু আজ শোব কোথায় ?

আগামীবারে সমাপ্য

এতক্ষণে যেন সুফিয়ার চেতনা হয়। তাই ত', কোথায়-ই-বা শুতে পারে ?

ওস্‌মান সুফিয়ার মুখভাব লক্ষ্য করে' বলে—আচ্ছা, এক কাজ করো—ওই বারান্দায় আমায় একটা . বিছানা পেতে দাও।

সুফিয়া বলে—ঠাণ্ডা লেগে অসুখ কর্‌বে যে তোমার। তুমি এখানে শোও, আমি বারান্দায় শুইগে।

ওস্‌মান হেসে ওঠে। বলে—সোনা পথে ফেলে ফাঁকা রুমালে গিট্‌, কেমন ? শেষে প্রাণে মারা যাব নাকি ? তার চেয়ে বরং ঘরেই একটা ব্যবস্থা করা যাক্‌, কি বলো ?

ওস্‌মানের কথা শুনে সুফিয়া নীরবে একটু হাসে। তারপর মেঝের ওপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে।

ওস্‌মান চৌকির ওপর শুয়ে কি যেন ভাবে। তারপর কোন এক সময়ে বলে ওঠে—ঘুমুলে নাকি, ও সুফিয়া ?

সুফিয়া সাড়া দেয়—কেন ?

ওস্‌মান অপ্রস্তুত হয়ে বলে—হ্যারিকেনের আলোটা একটু কমিয়ে দেবো কি ?

সুফিয়া গলা ঝেড়ে জবাব দেয়—না, থাক ! অন্ধকারে বড্ডো মশা লাগে।—বলেই আবার পাশ ফিরে শোয়।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটে।

আগামীবারে সমাপ্য

একটা অব্যক্ত বেদনার চঞ্চলতায় ওস্‌মান যেন ক্ষেপে উঠেছে। আবার ডাকে—সুফিয়া!

সুফিয়া দেহটা একটু মোচড় দিয়ে, একটা হাই তুলে তারপর বলে—কী?

ওস্‌মানের কণ্ঠে স্বর ফোটে না।

খানিক পর ফের ও বলে—শুন্‌ছ?

সুফিয়া বলে—ও রকম কর্‌ছ কেন? ঘুমোও।

ওস্‌মান বলে—পিঠ্‌টা একটু চুল্‌কিয়ে দেবে?

সুফিয়া উঠে এসে ওর পিঠ্‌টা চুলকিয়ে দেয়? তারপর আবার নিজের বিছানায় যেয়ে শুয়ে পড়ে।

ভোরে বুড়ীকে ডেকে ওস্‌মান বলে—আমি বাড়ী যাচ্ছি, খালা! মা'র সাথে দেখা করে' আবার ফিরে আস্‌ব। ওর কাছে টাকা রইল, যা' খরচের দরকার হয় নিয়ো।

বুড়ী বলে—আচ্ছা, এসোগে।

সুফিয়া ইসারা দিয়ে আড়ালে এনে ওর জামার বোতামটা লাগাতে লাগাতে বলে—কখন্ আস্‌বে?

—সন্ধ্যায়।

—কেন, সারাদিন কি কর্‌বে?—বলেই আহ্লাদ করে' ওস্‌মানের হাতের একটা আঙ্গুল মোচ্‌ড়ে দেয়।

ওসমান ওর মাথাটা নিজের বুকের কাছে নিয়ে

বলে—বোঝো না, লক্ষ্মীটি! সব কাজ গুছিয়ে আস্‌তে হবে যে।

সুফিয়া কালো দু'টি চোখে করুণ মিনতি নিয়ে বলে—এর বেশী দেরী করো না কিন্তু। আমার কেমন যেন লাগে।

ওস্‌মান স্মিত মুখে বলে—পারি যদি দুপুরেই এসে পড়্‌ব। আসি, কেমন?

সুফিয়া মাথা কাৎ করে বলে—এসো।

ওস্‌মান বাড়ী এসে ওর মা'র অবস্থা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌ল। এই ক'দিনের মধ্যেই ওর মা বিছানার সাথে মিশে গেছেন একেবারে। মুখটা করুণ পাংশুটে, চোখ দু'টি ঘোলা।

ওস্‌মানকে দেখে মা'র বেদনাতুর মুখে একটু হাসি ফুট্‌ল। বার দুই কেসে বল্‌লেন—আমি ত' মনে করেছিলুম তোকে হয়ত আর দেখে যেতে পারব না।—কথার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের পাতা ভিজে উঠ্‌ল।

ওস্‌মান্ ভয়ে ভয়ে বল্‌ল—কি হয়েছে মা?

মা আস্তে আস্তে বল্‌লেন—জ্বর।—বলে আবার একটু কেসে নিলেন। তারপর আবার বল্‌লেন—আর বুকেও কফ্ জমে গেছে।

ওস্‌মান উদ্বিগ্ন হয়ে বল্‌ল—ডাক্তার আনিগে?

মা হাত নেড়ে নিষেধ করে' বল্‌লেন—হেকিম সাহেবের বড়ি খাচ্ছি। একটু একটু আরাম বোধ হচ্ছে যেন। এ ক'দিন

আগামীবারে সমাপ্য

থেকে নুরনের নানীকে আমার কাছে রেখেছি। ও-ই সব করে' এনে দেয়।

বালির বাটীটা টুলের ওপর রেখে নুরনের নানী বল্‌ল—দু'চোখ বুজ্‌বার আগে বিয়েটা করে' ফেলো, ওস্‌মান! তোমার মা দেখে যাক।

ওস্‌মান হতভম্ব হয়ে নুরনের নানীর দিকে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে ও বল্‌ল—ফ্যাক্টরী থেকে একটু আস্‌ছি, মা!

চলে গেল তারপর।

দুপুর পর ওস্‌মানকে কাছে বসিয়ে ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মা বল্‌লেন—আমি ত' তোর মত না নিয়েই চৌধুরী বাড়ীর ওই হামিদার সাথে তোর বিয়ের কথা পাকাপাকি করে' ফেলেছি, বাবা! আমি জানি, তুই কখনো আমার অবাধ্য হস্‌নি, আর হবিও না। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

ওস্‌মান পাথর হয়ে বসে রইল।

মা ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন—তোরও বাপ্‌-ভাই কেউ নেই, ওরও এক মা ছাড়া দুনিয়ায় কেউ নেই। কোন পক্ষেরই কোন কিছু খরচ লাগ্‌বে না, সাদাসিধে ভাবে শুধু কল্‌মাটা পরিয়ে বৌ ঘরে নিয়ে আস্‌ব।

হঠাৎ ওস্‌মানের মনে হ'ল, কে যেন লোহার হাতুড়ি দিয়ে

ওর বুকটাকে পিটুছে। চঞ্চল হয়ে বল্‌ল—আচ্ছা, তুমি ভালো হয়ে নাও আগে।

মা স্থির কণ্ঠে বল্‌লেন—না বাবা, আমার হায়াত ফুরিয়ে এসেছে। আর খোদারও বোধ হয় তাই ইচ্ছে। আমি ঘর বেঁধে দিয়ে যাব। কালই বৌ ঘরে আন্‌তে চাই—কি বলিস্ বাবা?

কি যেন একটা কথা বল্‌তে গিয়ে ওস্‌মানের জিভ্‌টা হঠাৎ থেমে গেল। মনের কথাগুলো বেরিয়ে আস্‌বার পথ না পেয়ে —অক্ষমতার ক্ষুব্ধ বেদনায় যেন আর্ত্তনাদ করে' কাঁদে।

উভয়েরই মুখের কথা বন্ধ হয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর মা ফের স্থরু কর্‌লেন—তোর বৌয়ের মুখ না দেখে আমি শান্তিতে মর্‌তে পার্‌ব না। কী, তুই কিছু বল্‌বি নাকি, ওস্‌মান? বল্‌না বাবা, লজ্জা কি—মা'র কাছে বল্‌বিনে ত' আর বল্‌বি কার কাছে?

ওস্‌মানের কিছু বল্‌বার ছিল বৈ-কি! কিন্তু কে যেন ওর টুঁটি টিপে ধরেছে, কণ্ঠে স্বর ফুট্‌ল না। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মাঝে কামনার একটি ক্ষীণ আলো-শিখা নিয়ে ওর বুকের মানুষটি প্রতীক্ষমানা হয়ে যার জন্য বসে আছে—তাকে ছেড়ে সেখানে অন্য একজনকে অন্তর-লক্ষ্মী রূপে সে-যে কিছুতেই বরণ করে' নিতে পারে না, একথাটা ওর মাকে সে বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌ল না। লজ্জা যেন ওকে আচ্ছন্ন করে' ফেলেছে।

মন পীড়িত হয়ে উঠ্‌ল ওর।

ওর ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে' মা চিন্তিত হয়ে পড়্‌লেন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—মানুষ যে মৃত্যুর শর্ত্তটা হাতের মুঠোতে নিয়েই দুনিয়ার বুকে এসেছে, মর্‌তে একদিন হবেই। কাজ শেষ হবার আগেই যদি ডাক পড়ে যায় আমার, তবে মনে বড় দুঃখ থাকবে যে—আমার এই সংসারটা কারুর হাতে দিয়ে যেতে পার্‌লুম না।—এবার মা'র কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে উঠ্‌ল।—তোর কোন একটা কূল কিনারা হলো না, দুনিয়ায় তোকে দেখ্‌বার যে কেউ নেই। আশা ছিল মস্ত বড় কিন্তু—

ওস্‌মান দু' হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে বস্‌ল।

কয়েক মিনিট চুপ করে' থেকে স্নেহের স্বরে মা ডাক্‌লেন—ওস্‌মান!

ওস্‌মান নির্ব্বাক।

স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে মা আবার ডাক্‌লেন।

ওস্‌মান এবার উত্তর দিল—কী, মা?

ওর কণ্ঠস্বরে মা'র বুকের স্পন্দন যেন দ্রুততর হয়ে উঠ্‌ল। ওর একটি হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর রাখ্‌লেন। তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—আয়, আমার কাছে আয় বাপ্‌!

ওস্‌মান মাথা তুল্‌ল। কিন্তু অশ্রান্ত বর্ষণ-ধারার বেদনায় ওর চোখ দু'টি তখন লাল হয়ে উঠেছে।

মা'র বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল, ওকে এমন করে' কাঁদ্‌তে মা যে কখনো দেখেননি। মা এত করে'ও নিজেকে সাম্‌লাতে পার্‌লেন না, চোখ ফেটে জল আস্‌ল।

মাতা-পুত্রের এই ক্রন্দন-ধারার মাঝে বিধাতার কি ইঙ্গিত ছিল, তা' কে জানে?

অনেকক্ষণ পর আঁচলের খুটে ওস্‌মানের মুখটা মুছিয়ে দিয়ে, করুণ কণ্ঠে মা বল্‌লেন—কেঁদো না বাবা, দুঃখ কি—খোদা তোমাকে দেখ্‌বেন।—ওহ্‌, বুকের বেদনাটা আবার সুরু হলো যেন।

ওস্‌মান যেন ভয়ার্ত্ত শিশুর মতো চম্‌কে উঠ্‌ল। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বল্‌ল—আমি যাই মা, ডাক্তার নিয়ে আসি—এক্ষুনি।—বলেই উঠে যেতে উদ্যত হ'ল।

মা ওর হাত ধরে বাধা দিয়ে বল্‌লেন—এখন থাক্‌। হেকিম সাহেবের মালিশেই সেরে যাবে। বুকের এই পাশ্‌টায় একটু মালিশ কর্‌ ত', ওস্‌মান! ওই যে টুলের নীচে ওষুধের শিশিটা। অল্প করে' নিস্‌ কিন্তু।

মা'র একটু সেবা কর্‌তে পেয়ে ওস্‌মান যেন মনে মনে খুসী হয়ে উঠ্‌ল।

ও ভেবেছিল, মা একটু সুস্থ হ'লে পর সন্ধ্যা বেলা যেয়ে সুফিয়ার সাথে সে দেখা কর্‌বে, হয়ত সুফিয়াকে নিয়ে এসে মা'র

পা জড়িয়ে ধর্‌বে। কিন্তু বিকালের পর থেকে মা'র অবস্থা ক্রমেই খারাপ হ'তে লাগ্‌ল।

সেদিন ওস্‌মান আর স্থফিয়ার ওখানে যেতে পার্‌ল না।

সে রাত্রে স্থফিয়ার চোখে আর ঘুম আসেনি। ব্যাকুল প্রতীক্ষার একটা যন্ত্রনা নিয়ে সমস্ত রাতটা ছট্‌ফট্‌ করে' কাটিয়েছে; তবু ওস্‌মান আসেনি, হয়ত আর আস্‌বেও না।

সকাল বেলা বুড়ী এসে হাঁক্‌ দেয়ঃ

—ওমা, বৌ! এক গা রোদ হলো, এখনো ঘুমিয়ে আছো?—বলেই একটু চুপ করে' থাকে। তারপর কপাটে ঘা দিয়ে বলে—ওঠো গো, ওঠো!

স্থফিয়া তখন বালিশে মাথা গুঁজে কাঁদ্‌ছিল। বার দুই চোখ কচ্‌লে জল মুছে কপাট খুলে দিতেই বুড়ী বলে ওঠে—রাত্রে ওস্‌মান এসেছিল নাকি?

স্থফিয়া গলা ঝেড়ে বলে—না।

চৌকিটার ওপর বসে বুড়ী বলে—কি জানি ওদের মহল্লার নামটা বলেছিল?—ওয়াক্‌ ওয়াক্‌ ক্রট্‌—

এত দুঃখের ভেতরও স্থফিয়ার হাসি পায়। বলে—না

খালাআম্মা, ও যায়গাটার নাম—ওয়াটার ওয়ার্কস্ রোড। ইংরেজি নাম কিনা, তাই আপনি বল্‌তে পার্‌ছেন না।

বুড়ী বলে—তা' বেটি আমি পের্‌থম শুনেই ধরে ফেলেছি, ও নামের মাঝে ফিরিঙ্গী-গন্ধ আছে। তাইতেই ত' মুখে আসে না আমার। তুমি ত' পষ্টই কইতে পার্‌লে দেখ্‌ছি, ইংরেজিও জানো বুঝি?

সুফিয়া বলে—একটু একটু জানি।

—এঁ্যা!—বুড়ী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলে—বলো কী? ইংরেজি-জানা মেয়ে যে কখ্‌খনো ভালো হতে পারে না।

সুফিয়া ওর কথার কোন সঙ্গতি খুঁজে পায় না।

বুড়ীর অজ্ঞাতেই কথার মোড়টা ঘুরে যায়। বলে—ওই ঠিকানায় রমজানকে পাঠিয়ে দেবো?

সুফিয়া ঘাব্‌ড়ে যায়। বলে—কেন, খালাআম্মা?

বুড়ী বলে—ওস্‌মানকে ডেকে আন্‌তে।

সুফিয়া তাড়াতাড়ি বলে ফেলে—না খালাআম্মা, পাঠাবেন না ওকে। উনি নিষেধ করে' গেছেন।—একটু ভেবে মিথ্যা করে' সাজিয়ে বলে—আমাকে বলে গেছেন, 'যদি আমার আস্‌তে একদিন দেরী হয়, তবে কোন চিন্তে করো না, আর ডেকেও পাঠিয়ো না। আমি নিজেই আস্‌ব।'

বুড়ীর সর্ব্বাঙ্গ যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। হয়ত অসন্তোষের বেদনায়, হয়ত বা রাগে।

বুড়ি বলে—তাই বলো মা, তাই বলো। ভেতরে ভেতরে যে এত কথা হয়ে গেছে তা' আমি কেমন করে' জান্‌ব? তা' আমার কি এমন ঠেকা, কি জন্যে ডেকে পাঠাব ওকে! বাড়ী বদল কর্‌ল—একদিনও এসে জানাল না, বিয়ে কর্‌ল একটু খবর পর্য্যন্ত দিল না। আমরা কি কর্‌তে যাব ওদের বাড়ীতে। পের্‌বাদে বলে—'আপনার চেয়ে পর ভালো, পরের চেয়ে জঙ্গল—'

সুফিয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে বুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

খানিক পর বুড়ী উঠে দাঁড়িয়ে বলে—যাই, উনুনটা ধরিয়ে দিইগে।

সুফিয়া আপত্তি করে বলে—না, আপনি ধরাবেন না; আমি যাচ্ছি, মুখটা ধুয়ে আসি আগে।

বুড়ী বলে—আচ্ছা তবে।

সুফিয়া মুখ-হাত ধুয়ে, আয়নার সুমুখে এসে বসে। তারপর উনুন ধরাতে যায়।

বুড়ী তখন পাশের বাড়ীতে করমচা আন্‌তে গেছে।

রমজান এসে রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর বসে পড়ে। বসে বসে সুর ভাঁজে।

আগামীবারে সমাপ্য

ওর উচ্ছল স্বরের আঘাতে সুফিয়ার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। ইচ্ছা হয়, কয়েকটি ধারালো কথার খোঁচা দিয়ে ওর চোখা মুখটাকে থেঁৎলে দিতে। কী নির্লজ্জ বিট্‌কেল! এটা কি যাত্রা-গানের আসর পেয়েছে নাকি? ঘরের কোণে বসে যত সব ফচ্‌কেমো গান!

কোন এক ফাঁকে রমজান বলে—কি ভাবি, কেমন আছো?

সুফিয়া তাচ্ছিল্য ভাবে জবাব দেয়—দেখ্‌তেই ত' পাচ্ছ?

রমজান বলে—কই মুখই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—তা' আর কেমন করে' বুঝ্‌ব, ভালো না মন্দ। তুমিই বলো?

সুফিয়া কোন উত্তর দেয় না। মনে মনে কি যেন ভাবে।

রমজান অসহিষ্ণু হয়ে বলে—অমন হয়ে ফিরে বসেছ কেন, ভাবি? আমি বাঘ, না ভল্লুক?

সুফিয়া তিক্ত কণ্ঠে বলে—বাঘ ভল্লুক হলেও ভাল ছিল—

রমজান হেসে বলে—কিন্তুটা আবার কি খোলাসা করে' বলো না, শুনি?

সুফিয়া দৃঢ় হয়ে বলে—অত রকম রকম গান যে গাইতে পারে তাকে কি আবার সবটুকু বুঝিয়ে বল্‌তে হবে নাকি?—বলেই ঘাড় ফিরিয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকিয়ে নেয়।

ওর ওই কালো চোখের নজরে রমজানের মনে কেমন যেন একটা অসামঞ্জস্য বিশৃঙ্খল খাপছাড়া ভাব এনে দেয়। মনের ছন্দচ্যুতি ঘটে।

দুষ্টুমিতে মুখখানি ভরপূর করে' হেসে রমজান বলে—বাপ্‌রে! মেজাজ কী তিরিক্ষি! ওস্‌মান-ভাইকে ডেকে আন্‌ব? একদিনের অদর্শনেই এমন।

ওর মনের এই নোংরামি দেখে সুফিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হয়। বলে—কিছুদিন ভদ্দরলোকের দলে গিয়ে ওঠা-বসা করোগে।

কথাটায় রমজান যেন মজা পায়। হেসে বলে—তাইতেই ত' তোমার সাথে একটু ওঠা-বসা কর্‌ছি, ভাবি! বুদ্ধিতে একটু সর্দ্দি লেগেছে কিনা! হেঁ হেঁ—া—বলেই উঠে গিয়ে সুফিয়ার মুখের সাম্‌নে বসে পড়ে।

ওর এই কথার আমেজ সহসা সুফিয়ার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়, দেহের স্নায়ুগুলো অকারণ সাড়া দেয়।

রমজান বলে—কি ভাবি, রাগ কর্‌লে নাকি? অমন চুপ্‌ হয়ে আছো যে?

কি জানি কেন সুফিয়ার গা রিম্‌ঝিম্‌ করে' ওঠে। আত্ম-সম্বরণ করে' বলে—না, রাগ হবো কেন?—কথা শেষ করে' হয়ত ভদ্রতার খাতিরেই একটু হাসে।

ওর হাসিতে রমজানের আশার-বাতায়নে যেন একটা বিদ্যুৎ ঝিলিক্ মেরে ওঠে।

ও বলে—আচ্ছা ভাবি, তুমি কেন অমন মুখ ভার করে' থাকো, বলো ত'? আমরা বুঝি মানুষ না?

সুফিয়া যেন চাবুক খেয়ে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে। দু' চোখের দৃষ্টি জিজ্ঞাসায় ধারালো করে' বলে—মানে?

রমজান পকেট থেকে একটি বিড়ী বের করে' উনুনের আগুনে ধরায়। তারপর বলে—মানে?—মানে কিছু নেই! লেখা-পড়া জান্‌লে ত' মানে-টানে বল্‌ব।

ওর এই ওৎ পেতে বসে থাকায় সুফিয়ার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলে—দেখি সরো ত'—ঘরটা এখনো ঝাঁটানো হয়নি।

রমজান বিড়ীতে টান দিয়ে বলে—তাড়িয়ো না ভাবি, অমন করে' তাড়িয়ো না। রূপ আছে বলে কি দু'টো মিষ্টি কথাও বলতে নেই?

একটা অবান্তর ও বিস্ময়কর জ্ঞান লাভ করার লজ্জায় দুঃখে সুফিয়া যেন মাটির সাথে মিশে যায়। ওর ঠোঁট দু'টি ঈষৎ কেঁপে ওঠে।

ওকে নিরুত্তর দেখে রমজান কি একটা কথা বল্‌বার জন্য

আগামীবারে সমাপ্য

উস্‌খুস্‌ কর্‌ছিল।—এমন সময় বুড়ী এসে পড়ায় আর কোন কথাই বলা হয় না।

স্তব্ধ দুপুর। ভাঙা জানালার পথে দেখা যায়—এক টুক্‌রো রহস্য-ধূসর আকাশ। ছেঁড়া পাৎলা মেঘের-পর্দ্দাগুলো ঝাঁক-বেঁধে আকাশে ভেসে বেড়ায়, একটা চিল দীর্ঘ ডানা মেলে অবিরাম পাক্‌ খায়। সুফিয়া বিছানায় পড়ে পড়ে তাই দেখে। —দেখে দেখে মনে বৈরাগ্য আসে।

তারপর শিথিল দেহটি কোন এক অসতর্ক অবসরে তন্দ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

ওর ঘুমন্ত অবস্থায় রমজান পা টিপে টিপে ঘরে ঢোকে। সকাম শাণিত দৃষ্টিতে সুফিয়ার পরিপূর্ণ দেহটার দিকে চেয়ে থাকে। বুটা-তোলা খদ্দরের শাড়িটা চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু! এলো চুলের বোঝাটা কাঁধের একপাশ দিয়ে এসে নগ্ন সুডৌল একটি বাহুর ওপর সস্নেহে লুটিয়ে পড়েছে। ওর ইচ্ছা হয়, ক্ষুধার্ত্ত সাপের মতো সুফিয়ার বুকের সাথে জড়িয়ে যেতে।

ও চোখ ফেরাতে পারে না আর—দেখেই দেখে। চেয়ে চেয়ে আবেশে মাদকতায় ওর বুকের রক্ত ফেনিল হয়ে ওঠে।

ও যেন দৃষ্টির তীক্ষ্নতা দিয়ে সুফিয়ার সর্ব্বাঙ্গ জখম করে' দিতে চায়।

কতক্ষণ যে এম্‌নি কেটে যায়, তা' কে জানে!

কি একটা শব্দে হঠাৎ সুফিয়া চোখ মেলে চায়। রমজান তখন ওর মাথার কাছে এসে বিছানার ওপর বসেছিল। সুফিয়া ধড়্‌মড়্‌ করে' উঠে পড়ে। সে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিল না। সুতীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—কি চাই এখানে?

ওস্‌মান ওর চোখের দিকে চেয়ে ভড়্‌কে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে বলে—বাপ্‌রে, কী চাউনী! ভস্ম করে' দেবে নাকি, ভাবি?

সুফিয়া দীপ্তকণ্ঠে বলে—অসভ্য কোথাকার!—বলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বুড়ীর ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। তারপর দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপায়।

বুড়ী তখন ছেঁড়া কাঁথাটায় তালি লাগাচ্ছিল। কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে বিস্মিত হয়ে শুধোয়—কিগো, অমন কচ্ছ কেন তুমি?

উত্তর দেবার মতো মনের অবস্থা সুফিয়ার নেই।

আত্ম-অপমানের একটা সস্তা প্রতিশোধ নেবার জন্য রমজান উঠান্‌টার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিতে শাণ দিচ্ছিল। সুযোগ

পেয়ে হঠাৎ বলে ওঠে—তুমি আচ্ছা লোককেই ঘরে ঠাঁই দিয়েছ খালা, পাড়ার লোকের কাছে আর মুখ দেখাবার জো নেই আমাদের।

বুড়ী হতভম্ভ হয়ে বলে—কি হয়েছেরে?

রমজান কথায় প্যাঁচ লাগিয়ে বলে—হবে আবার কি? পেছনের জানালা দিয়ে হালিম ছোঁড়ার সাথে ইসারা-বিসারা কর্‌ছিল। আমি দেখ্‌তে পেয়ে ভাবিকে ধমক দিয়েছি বলে, আমায় বলে কিনা—ইতর, অসভ্য, আরো কত কি—

নিরুপায় সহিষ্ণু নারী-প্রবৃত্তি সুফিয়ার বুকের ভেতর অসহায় হয়ে কেঁদে ওঠে।

বুড়ী যেন আকাশ থেকে পড়ে। বলে—বলিস্ কিরে, এঁ্যা!—খানিক স্তব্ধ থেকে বলে—আমি আগেই বলেছি, ইংরেজি-জানা মেয়ে কখ্‌খনো ভালো হ'তে পারে না। তা' তোকে গালিগালাজ কর্‌ল কেন, ভাতার-খাগীর বেটি?

বুড়ীর মুখের ভদ্রতার লাগাম যেন খুলে গেছে। আরো বলে—রাখ্, ওস্‌মানকে আস্‌তে দে আগে। সালাম করি বাবা, এমন মানুষের বাতাসকেও সালাম করি।

হৃদয়হীন নির্ম্মম কৌতুকে, বিকট পাশবিক উল্লাসে হেসে রমজান বলে—ছাখো খালা, তুমিই ছাখো, দু'দিনের মধ্যে কী কীর্ত্তি কর্‌লে। অথচ আমাদের সাথে সরমে কথাটি বলে না।

আগামীবারে সমাপ্য

বুড়ী তিক্ত কণ্ঠে বলে—তা' বল্‌তে যাবে কেন বাপু, তোরা যে মুখ্‌খু ছোটোলোক।

তারপর বিড়্‌ বিড়্‌ করে' বুড়ী যা' বলে তা' স্পষ্ট শোনা যায় না। অস্ফুট, ক্ষীণ।

সুফিয়ার কণ্ঠ চিরে কান্না পায়। একি তার অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস, না নির্ব্বোধ নিষ্ঠুর মানুষের অবিচার? ওর নারীত্বের এমন জঘন্য অসম্মান? এর জন্যে কি একদিন জবাবদিহি কর্‌তে হবে না? এই অপবাদের একটা বাস্তব প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ সে কর্‌তে পার্‌ত, কিন্তু মানুষকে বোঝাবার মতো প্রতিবাদের তেমন শব্দময় ভাষা ত' আজো সৃষ্টি হয়নি! হঠাৎ মনে হয়, ওস্‌মান শুন্‌লে একথা কি বিশ্বাস কর্‌বে? না না, সে কখনো একথা বিশ্বাস্‌ কর্‌তে পারে না। সে আজ যদি কাছে থাক্‌ত তা'হলে ত' আর তার নারীত্বের এমন অপমান হ'ত না। কেন সে এমন ভাবে তাকে ফেলে রেখে গেল? ভেবে, ওস্‌মানের প্রতি ভারি রাগ হয়।

সে নিদ্রাহীন রাত্রিটা মা'র পাশে বসেই ওস্‌মান কাটিয়ে দিয়েছে। সকালের দিকে জ্বরটা একটু কমই ছিল, কিন্তু বুকের ব্যথায় মা ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিলেন। তবু ওস্‌মান ভেবেছিল, এক ফাঁকে কাজী লেনে যেয়ে, সুফিয়াকে বলে আস্‌বে যে, তার মা'র শোচনীয় অবস্থার জন্যই সে গত রাত্রে আস্‌তে পারেনি। শুধু তাই নয়, আরো অনেক কথাই বুকে জড় করে' রেখেছিল।

কিন্তু বিধাতাপুরুষ তা' আর হ'তে দিলেন কই!

বেলা বেড়ে উঠ্‌তেই জ্বরের তাড়নায় মা'র প্রলাপ বকা সুরু হ'ল। একেক সময় বলে উঠ্‌ছিলেন—ওস্‌মান, বৌ, মা, খোদা—

উদ্বেগে ওস্‌মানের বুক শুকিয়ে গেল।

দুপুর পর জ্বর কম্‌ল আবার। হঠাৎ ওস্‌মানের বুকে যেন আশার সঞ্চার হ'ল। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মাঝে ক্ষীণ

বিদ্যুতের ঝিলিক্ যেন। ও বল্‌ল—এখন কেমন লাগ্‌ছে তোমার, মা?

নরম নীচু আওয়াজে মা বল্‌লেন—একটু ভালো লাগ্‌ছে।

হঠাৎ মা'র বুকের স্পন্দন যেন দ্রুত হয়ে উঠ্‌ল। স্পন্দন ঠিক নয়, মৃত্যুর পদধ্বনি!

ওস্‌মান বসে বসে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

স্নেহ-শীতল দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মা বল্‌লেন—তুই ত' কিছু বল্‌লিনে বাবা? আমি যে হামিদার মাকে আজ্‌কের কথা বলেছি।

হঠাৎ ওস্‌মানের মনটা যেন ফর্সা হয়ে উঠ্‌ল। ভাবল:

এই তার চমৎকার সুযোগ। সুফিয়াকে এখনই যেয়ে নিয়ে আস্‌বে সে। ওকে দেখ্‌লে মা আপনা থেকেই ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। হয়ত তক্ষুণি কাজী ডেকে বিয়ের কল্‌মা পড়িয়ে দেবেন। তারপর? তারপরের টুকু মনে কর্‌তেই ওর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল।

ওস্‌মান আর কোন দ্বিধা না করে' সোসাসুজি বলে ফেল্‌ল—আমি আবার বল্‌ব কি মা, তোমার যা' খুসী করো।

করুণা যেন ওঁর চোখ ফেটে পড়্‌ছিল। খুসী হয়ে বল্‌লেন—পাড়ার মেয়ে যখন—আমাদের বাড়ীতে এনেই সাদী পড়ানো যাবে। কি বলিস্, ওস্‌মান?

আগামীবারে সমাপ্য

ওস্‌মান কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা এই ফাঁকে মনে মনে বিশ্ব-ভাণ্ডারীর কাছে ওস্‌মানকে আমানত রাখ্‌লেন।

নিজের ঘরে এসে জামাটা গায় দিয়ে নুরনের নানীকে ডেকে ওস্‌মান বল্‌ল—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, মা জিগ্‌গেস্‌ কর্‌লে বলে দিয়ো।

নুরনের নানী বল্‌ল—শীগ্‌গিরই এসো বাপু!

ওস্‌মান বল্‌ল—এই এলুম বলে।

তারপর পথ ধর্‌ল।

একটা অধীর চঞ্চল আনন্দে পথ চলে আর ভাবে:

সুফিয়ার কথা, মা'র মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে সুফিয়ার সাথে তার বিয়ে—আরো কত কি—

হঠাৎ ওর বুকের রক্ত একটা অস্থির চঞ্চলতায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

বুকটা অগণন কথায় ঠাসা করে' পথ ভেঙে চলে।

ক্রোশখানেক পথ পেছনে ফেলে বাজারের চৌমাথায় আস্‌তেই কাজী লেনের নার্‌কেল গাছগুলো নজরে পড়ে। ওস্‌মান পুলকিত হয়ে ওঠে।

আগামীবারে সমাপ্য

বুড়ী তখন ঘরের রোয়াকের ওপর বসেছিল। ওস্‌মানের ডাক শুনেই বলে ওঠ্‌ল—আয়, আমি তোর কাছে খবর পাঠাব বলে মনে করেছিলুম।

ওস্‌মান মাদুরটার ওপর বসে পড়্‌ল। তারপর দক্ষিণ দিক্‌কার ঘরের পানে তাকিয়ে বল্‌ল—কেন, খালা?

সুফিয়া কপাটের আড়ালে এসে কাণ দু'টি খাড়া করে' দাঁড়িয়ে রইল।

বুড়ী বল্‌ল—আচ্ছা বৌ পেয়েছিস্‌ তুই, ওস্‌মান! মাগো, মা! দু'দিনের মধ্যেই পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেল।

হঠাৎ ওস্‌মানের মাথায় কে যেন লোহার ডাণ্ডা দিয়ে একটা বাড়ী মারল। খানিক স্তব্ধ থেকে প্রাণপণে নিজেকে সচেতন করে' ভয়ে ভয়ে বল্‌ল—কী, ব্যাপার কী?

বুড়ী স্পষ্ট করেই বলে ফেল্‌ল—এমন ছেনালকে ঘরে ঠাঁই দিতে হয়? আমাদের মান-ইজ্জত আর কিছু রইল না। দু'দিনের মধ্যেই এটাকে বেশ্যে-বাড়ী করে' ফেলেছে। দিনে দুপুরেই পাড়ার ছোঁড়ারা বাড়ীর ভেতর আসে, যায়, হি হি করে' হাসে।

বুড়ীর এই কথায় বিধাতা তখন চম্‌কে উঠেছিল কিনা, কে জানে?

ওস্‌মানের দেহের চেতনা যেন লোপ পেয়ে গেছে। একদম্‌

বোবা, বধির, নিশ্চল সে। একটা প্রলয়ের ঝড় যেন ওকে ঘিরে দাপাদাপি কর্‌ছে।

বুড়ী ফের বল্‌ল—আমরা বল্‌তে গেলে উল্টো আরো গালাগাল দেয়। কী পোক্ত ছেনাল!

পৃথিবীটা এমন করে' ওস্‌মানের চোখের সাম্‌নে দুল্‌ছে কেন? ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? হঠাৎ ওর মনে হ'ল, ওর পায়ের তলা থেকে মাটী যেন সরে যাচ্ছে।

কথাটা ওস্‌মান বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিল না। স্থফিয়া এমন বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌তে পারে এ'ও কি সম্ভব? কিন্তু বুড়ীর কথাও ত' অবিশ্বাস করা যায় না। অকারণ একজনের নামে এতবড় একটা মিথ্যা কথা কেন-ই-বা বল্‌বে? আর মিথ্যা হলে কি স্থফিয়া ওর সাম্‌নে এসে এর প্রতিবাদ কর্‌ত না?

ওস্‌মানকে নিরুত্তর দেখে বুড়ী নিজেই বল্‌ল—কোন কথা বল্‌ছিস্‌নে যে, ওস্‌মান?

বুড়ীর গলার আওয়াজে ওস্‌মানের হুঁস্ হ'ল। মুখের ও বুকের ঘাম মুছে নিয়ে শুষ্ক মুখে বল্‌ল—কী কথা বল্‌ব, খালা?

বুড়ী মুখ কালো করে' বল্‌ল—আজই বাপু, ওকে এখান থেকে নিয়ে যা, নইলে আমরা আর এবাড়ীতে টিক্‌তে পার্‌ব না। পাড়ার মুরব্বীরা বাদী হয়ে গেছে।

আগামীবারে সমাপ্য

হঠাৎ ফালির জীবনের ইতিহাসের একটা নোংরা নগ্ন পাতা ওস্‌মানের মনে পড়ে গেল। ভাব্‌ল:

সুফিয়াও ত' ফালিরই জাত, কাজেই কথাটা মিথ্যা হতে পারে না। ভালোবাসার নামে ছদ্মবেশী বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুর শঠতা যত-কিছু সবই ওদের পক্ষে সম্ভব। ওরা সবই কর্‌তে পারে।

ব্যথায় ঘৃণায় ওর মন তিক্ত হয়ে উঠ্‌ল। উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—আমি যাচ্ছি, খালা! মা'র অবস্থা ভয়ানক খারাপ, কখন যে কি হয় বলা যায় না।

বুড়ী সে কথায় কাণ না দিয়ে নিজের কথারই জের টান্‌ল—তোর বৌকে নিয়ে যাবিনে?

ওস্‌মান বল্‌ল—না। ওকে তুমি বলে দিয়ো—ওর যেখানে ইচ্ছে চলে যায় যেন।

যুগ যুগের সঞ্চিত কামনা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে, বুকের স্পন্দন দিয়ে গড়া একটা সৃষ্টি যেন এক মুহূর্ত্তে এক ফুঁয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল।

বুড়ী আর রমজানের ব্যবহারে সুফিয়া একদম্‌ মুশ্‌ড়ে পড়েছিল। এই বাড়ীর আবহাওয়াও যেন ওর কাছে বিষাক্ত বলে বোধ হচ্ছিল। সে বড় আশা করে' বসেছিল, ওস্‌মান এলে তাকে সব কথা খুলে বল্‌বে। বল্‌বে, সে আর এক মুহূর্ত্তও এই বাড়ীতে থাকবে না। ওস্‌মান ছাড়া যে তার আর কারো কাছে

কিছু বল্‌বার নেই। এমন কি পৃথিবীর কাছেও না। ওকে অসহায় পেয়ে যে ওরা এমন করে' অপমান কর্‌ল, এটা কি ওস্‌মান বুঝ্‌বে না।

সে আরো ভেবেছিল, পৃথিবীর সমস্ত লোক এসেও যদি ওর বিরুদ্ধে ওস্‌মানের কাছে কিছু বলে, তবুও ওস্‌মান তাদের কথা বিশ্বাস কর্‌বে না। কিন্তু যখন ওস্‌মানের নিজের মুখের শেষ কথাটা সে শুন্‌ল, তখন—তখন আর তার বিস্ময়ের অবধি রইল না।

একটা অসহ্য ব্যথায় সুফিয়ার বুকটা যেন হঠাৎ চিড়্‌ খেয়ে গেল। কোথা থেকে একটা সর্ব্বনাশের ঝড় এসে ওর জীবনটাকে যেন উলঙ্গ করে' দিয়ে গেল।

ওস্‌মানের কথাটা শুনে বুড়ী খানিক স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বল্‌ল—হাজার হ'লেও ত' ঘরের বৌ! সে যাবে কোথায়?

ওস্‌মান তিক্ত কণ্ঠে বল্‌ল—এখন কি আর ওর যাবার যায়গার অভাব হবে, খালা?—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।—বলেই চল্‌তে সুরু কর্‌ল।

ওস্‌মান তখন সদর দরজাটার কাছাকাছি এসে পড়েছে।

সুফিয়া টল্‌তে টল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেয়ালটার কাছে দাঁড়াল। দেহের সমস্ত চেতনা কণ্ঠে নিয়ে বহু কষ্টে বল্‌ল—তোমার পায়ে পড়ি, একটা কথা শোন।

ওস্‌মান ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—কেন, এ পাড়ায় এত লোক থাক্‌তে আমার কাছে আবার কিসের কথা? তোমার কথা শুন্‌বার লোক ঢের আছে।

স্থফিয়ার বুকটা পুড়ে খাক্‌ হয়ে যাচ্ছিল। গলাটা পরিষ্কার করে বল্‌ল—কিন্তু আমার কাছে কি তোমার কিছুই শুন্‌বার নেই?

ওস্‌মান তেম্‌নি রুক্ষ কণ্ঠে বল্‌ল—না।—বলেই বেরিয়ে চলে গেল।

স্থফিয়ার পা দু'টি যেন পাথর হয়ে গেছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। এক বিন্দু ক্ষতির সম্ভাবনায় আগে যে চোখে জলের ধারা বইত, আজ জীবনের পরম ক্ষতির দিনে—ওর সর্ব্বনাশের দিনে কোথায় গেল সে চোখের এত জল?

ওর সমস্ত মুখ করুণ পাংশুটে হয়ে উঠ্‌ল। বেদনা-কাতর দু'টি চোখ কেঁপে কেঁপে অস্ত-দিগন্তের রাঙা-মেঘমালাকে এই নিষ্ঠুরতার সাক্ষী করে' রাখল।

একটা দম্‌কা বাতাস এসে হায় হায় করে চলে গেল।

আগামীবারে সমাপ্য

কামনার ভীরু-প্রদীপটি গেল নিভে। পেছনে রইল স্মৃতি-জড়ানো পদচিহ্ন, সুমুখে রইল জীবনের অসমাপ্ত অন্ধকার পথ।